ইয়া আল্লাহ্ এদেরকে শাস্তি দিন। কেননা, এরা আপনার পরিবর্তে আমাদেরকে উপাস্য করে নিয়েছিল।

أَلَمْ تَرَ أَنَّآ أَرْسَلْنَا الشَّيٰطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا
تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٨٤﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ
وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفٰعَةَ
إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ﴿٨٧﴾

(৮৩) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি কাফিরদের উপর শয়তানদেরকে ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে বিশেষভাবে (মন্দকর্মে) উৎসাহিত করে। (৮৪) সুতরাং তাদের ব্যাপারে আপনি তারাহুড়া করবেন না। আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র। (৮৫) সেদিন দয়াময়ের কাছে পরহিজগারদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব, (৮৬) এবং অপরাধীদেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (৮৭) যে দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছে, সে ব্যতীত আর কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আপনি যে তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে দুঃখ করেন তখন) আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে, আমি শয়তানদেরকে কাফিরদের উপর (পরীক্ষার্থে) ছেড়ে দিয়েছি। তারা তাদেরকে (কুফর ও পথভ্রষ্টতায়) খুব উৎসাহিত করে। (এমতাবস্থায় যারা স্বেচ্ছায় তাদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর প্ররোচনায় উৎসাহিত হয়, তাদের জন্য দুঃখ কিসের?) আপনি তাঁদের জন্য তাড়াহুড়া (করে আযাবের দরখাস্ত) করবেন না। আমি স্বয়ং তাদের (শাস্তিযোগ্য) বিষয়াদি গণনা করছি। (তাদের এই শাস্তি ঐ দিন হবে) যেদিন আমি পরহিজগারদেরকে দয়াময় আল্লাহ্র কাছে আতিথিরূপে সমবেত করব এবং অপরাধী-দেরকে পিপাসার্ত অবস্থায় দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাব। (তাদের কোন সুপা-রিশকারীও থাকবে না। কেননা সেখানে) কেউ সুপারিশ করার অধিকারী হবে না; কিন্তু যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছ থেকে অনুমতি লাভ করেছে। (তারা হচ্ছেন পয়গম্বর ও সৎ কর্মপরায়ণ মনীষীবৃন্দ। আর অনুমতি একমাত্র ঈমানদারদের জন্যই হবে। সুতরাং কাফিররা সুপারিশের পাত্র হবে না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

تَؤُزُّهُمْ أَزًّا---আরবী অভিধানে هَزَّ - أَزَّ - حَضَّ শব্দগুলো একই অর্থে

ব্যবহৃত হয়; অর্থাৎ কোন কাজের জন্য উৎসাহিত করা। লঘুতা, তীব্রতা ও কম-বেশির দিক দিয়ে এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক তারতম্য রয়েছে। أَزّ শব্দের অর্থ পূর্ণ শক্তি, কৌশল ও আন্দোলনের মাধ্যমে কাউকে কোন কাজের জন্য প্রস্তুত বরং বাধ্য করে দেওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, শয়তানরা কাফিরদেরকে মন্দ কাজে প্রেরণা যোগাতে থাকে, মন্দ কাজের সৌন্দর্য অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয় এবং অনিষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেয় না।

إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا—উদ্দেশ্য এই যে, আপনি তাদের শাস্তির ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না। শাস্তি সত্বরই হবে। কেননা আমি তাদেরকে দুনিয়াতে বসবাসের জন্য যে গুনাগুনতি দিন ও সময় দিয়েছি, তা দ্রুত পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর শাস্তিই শাস্তি। نَعُدُّ لَهُمْ অর্থাৎ আমি তাদের জন্য গণনা করছি। এর উদ্দেশ্য এই যে, কোন কিছুই বেগাহীন নয়। তাদের বয়সের দিবারাত্রি গণনার মধ্যে রয়েছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের চলাফেরার এক একটি পদক্ষেপ, তাদের আনন্দ ও তাদের জীবনের এক-একটি মুহূর্ত আমি গণনা করছি। গণনা শেষ হওয়া মাত্র তাদের উপর আযাব ঝাঁপিয়ে পড়বে।

খলীফা মামুনুর রশীদ একবার সূরা মারইয়াম পাঠ করলেন। এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি দরবারে উপস্থিত আলিম ও ফিকাহ্‌বিদগণের মধ্য থেকে ইবনে সাম্মাকের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন: এ সম্পর্কে কিছু বলুন। ইবনে সাম্মাক আরয করলেন: আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসই যেখানে গুনতিকৃত, তখন তো তা খুবই দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাবে। জনৈক কবি বলেছেন:

حياتك انفاس تعد فكلما
مضى نفس منك انتقص به جزء

অর্থাৎ তোমার জীবনের শ্বাস-প্রশ্বাস গুনতিকৃত। একটি শ্বাস পেছনে চলে গেলে তোমার জীবনের একটি অংশ হ্রাস পায়।

কথিত রয়েছে, মানুষ দিবারাত্রে চব্বিশ হাজার শ্বাস গ্রহণ করে।—(কুরতুবী)

জনৈক বুযুর্গ বলেছেন:

وكيف يفرح بالدنيا ولذتها
فتى يعد عليه اللفظ والنفس

অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুনিয়া ও দুনিয়ার আনন্দে কিরূপে বিভোর ও নিশ্চিত হতে পারে, যার কথা ও শ্বাস-প্রশ্বাস গণনা করা হচ্ছে।—(রূহুল মা'আনী)

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا---যারা বাদশাহ্ অথবা কোন শাসনকর্তার কাছে সম্মান ও মর্যাদা সহকারে গমন করে, তাদেরকে وفد বলা হয়। হাদীসে রয়েছেঃ তারা সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে সেখানে পৌঁছবে এবং প্রত্যেকের সওয়ারী তাই হবে, যা সে দুনিয়াতে পসন্দ করত। উদাহরণত উট, ঘোড়া ও অন্যান্য সওয়ারী। কেউ কেউ বলেনঃ তাদের সৎ কর্মসমূহ তাদের প্রিয় সওয়ারীর রূপ ধারণ করবে। ---(রূহুল মা'আনী, কুরতুবী)

اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا---ورد-এর শাব্দিক অর্থ পানির দিকে যাওয়া। বলা বাহুল্য, পিপাসা লাগলেই মানুষ অথবা জন্তু পানির দিকে যায়। তাই وِرْدًا-এর অনুবাদ পিপাসার্ত করা হল।

مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا---হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেনঃ عهد (অঙ্গীকার) বলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'র সাক্ষ্য বোঝানো হয়েছে। কেউ বলেনঃ عهد বলে কোরআনের হিফ্য বোঝানো হয়েছে। মোটকথা, সুপারিশ করার অধিকার প্রত্যেকেই পাবে না। যারা ঈমান ও অঙ্গীকারে অটল থাকে, শুধু তারাই পাবে।---(রূহুল মা'আনী)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ
يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ
وَلَدًا ﴿٩١﴾ وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾ اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ اِلَّآ اٰتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾ لَقَدْ اَحْصٰىهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ اٰتِيْهِ
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَرْدًا ﴿٩٥﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ
الرَّحْمٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَاِنَّمَا يَسَّرْنٰهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَ تُنْذِرَ بِهٖ

قَوْمًا لُّدًّا ﴿٩٧﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ ۖ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ
أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

(৮৮) তারা বলে ঃ দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৮৯) নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। (৯০) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণবিচূর্ণ হবে। (৯১) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহ্র জন্য সন্তান আহবান করে। (৯২) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯৩) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহ্র কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (৯৪) তার কাছে তাদের পরিসংখ্যান রয়েছে এবং তিনি তাদেরকে গণনা করে রেখেছেন। (৯৫) কিয়ামতের দিন তাদের সবাই তার কাছে একাকী অবস্থায় আসবে। (৯৬) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ্ ভালবাসা দেবেন। (৯৭) আমি কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা পরহিজগারদেরকে সুসংবাদ দেন এবং কলহকারী সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (৯৮) তাদের পূর্বে আমি কত মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি। আপনি কি তাদের কাহারও সাড়া পান, অথবা তাদের ক্ষীণতম আওয়াজও শুনতে পান?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা (কাফিররা) বলে ঃ (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান (ও) গ্রহণ করে রেখেছেন (সেমতে বিপুলসংখ্যক খৃস্টান অল্পসংখ্যক ইহুদী এবং আরবীয় মুশরিকরা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,) তোমরা (এ কথা বলে) গুরুতর কাণ্ড করেছ। এর কারণে হয়তো আকাশ ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে এবং পর্বতমালা ভেঙ্গে পড়বে; কারণ, তারা আল্লাহ্র সাথে সন্তানকে সম্বন্ধযুক্ত করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য শোভনীয় নয়। (কেননা) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সবাই আল্লাহ্ তা'আলার সামনে গোলাম হয়ে উপস্থিত হয় (এবং) তিনি সবাইকে স্বীয় কুদরত দ্বারা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং (স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সবাইকে গণনা করে রেখেছেন। (এ হলো তাদের বর্তমান অবস্থা) এবং কিয়ামতের দিন সবাই তাঁর কাছে একাকী উপস্থিত হবে। (প্রত্যেকেই আল্লাহ্ তা'আলারই মুখাপেক্ষী ও আজ্ঞাবহ হবে। সুতরাং আল্লাহ্র সন্তান থাকলে আল্লাহ্র মতই "সদাসর্বদা বিদ্যমান" গুণে গুণান্বিত হওয়া উচিত ছিল। সর্বব্যাপী কুদরত ও সর্বব্যাপী জ্ঞান হচ্ছে আল্লাহ্র সিফাত এবং মুখাপেক্ষিতা ও আনুগত্য হচ্ছে অন্যের সিফাত। এগুলো একটি অপরটির বিপরীত। সুতরাং এই বিপরীত গুণের একত্র সমাবেশ কিরূপে হতে পারে?)

নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আল্লাহ্ তা'আলা (তাদেরকে উল্লিখিত পারলৌকিক নিয়ামত ছাড়া দুনিয়াতে এই নিয়ামত দেবেন যে,)

তাদের জন্য (সৃষ্ট জীবের অন্তরে) ভালবাসা সৃষ্টি করে দেবেন। (সুতরাং আপনি তাদেরকে এই সুসংবাদ দিন। কেননা) আমি এই কোরআনকে আপনার (আরবী) ভাষায় সহজ করে দিয়েছি, যাতে আপনি এর দ্বারা আল্লাহ্-ভীরুদেরকে সুসংবাদ দেন এবং তর্কপ্রিয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করেন। (সতর্কীকরণের বিষয়াদির মধ্যে জাগতিক শাস্তির একটি বিষয়বস্তু এও যে) আমি তাদের পূর্বে কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি! (অতএব) আপনি কি তাদের মধ্যে কাউকে দেখেন, অথবা কারও কোন ক্ষীণতম শব্দও শোনেন? (এখানে তাদের নাম-নিশানা মুছে যাওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং কাফিররা এই জাগতিক শাস্তিরও যোগ্য। যদিও কোন উপকারিতার কারণে কোন কাফিরের ওপর এই শাস্তি পতিত হয়নি; কিন্তু আশংকার যোগ্য তো অবশ্যই।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا---এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, মৃত্তিকা, পাহাড় ইত্যাদিতে বিশেষ এক প্রকার বুদ্ধি ও চেতনা বিদ্যমান আছে, যদিও তা মানুষের বুদ্ধি ও চেতনার ন্যায় খোদায়ী বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়ার স্তর পর্যন্ত উন্নীত নয়। এই বুদ্ধি ও চেতনার কারণেই পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু আল্লাহ্ নামের তসবীহ্ পাঠ করে, যেমন কোরআন বলে ঃ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রশংসা কীর্তন করে না,---এমন কোন বস্তু দুনিয়াতে নেই। বস্তুসমূহের এই বুদ্ধি ও চেতনাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করলে বিশেষত আল্লাহ্র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করলে পৃথিবী, পাহাড় ইত্যাদি ভীষণরূপে অস্থির ও ভীত হয়ে পড়ে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জিন ও মানব ছাড়া সমস্ত সৃষ্ট বস্তু শিরকের ভয়ে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।---(রূহুল মা'আনী)

وَعَدَّهُمْ عَدًّا ---অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবমণ্ডলীর ব্যক্তিত্ব ও কর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান রাখেন। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস, তাদের পদক্ষেপ, তাদের লোকমা ও ঢোক আল্লাহ্র কাছে গণনাকৃত। এতে কমবেশী হতে পারে না।

سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا----অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মে দৃঢ়পদ ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বন্ধুত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। উদ্দেশ্য এই যে, ঈমান ও সৎ কর্ম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করলে এবং বাইরের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত হলে ঈমানদার সৎকর্মশীলদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি পয়দা হয়ে যায়। একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি অন্য একজন সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তির সাথে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে যায় এবং অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্ট জীবের মনেও আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি মহব্বত সৃষ্টি করে দেন।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রার রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে পছন্দ করেন, তখন জিবরাঈলকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালবাসি, তুমিও তাকে ভালবাস। অতঃপর জিবরাঈল সব আকাশে এ-কথা ঘোষণা করেন এবং তখন আকাশের অধিবাসীরা সবাই সেই বান্দাকে ভালবাসতে থাকে। এরপর এই ভালবাসা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়। ফলে পৃথিবীর অধিবাসীরাও তাকে ভালবাসতে থাকে। তিনি আরও বলেনঃ কোরআন পাকের এই আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়ঃ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (রূহুল মা'আনী) হারেম ইবনে হাইয়্যান বলেনঃ যে ব্যক্তি সর্বান্তকরণে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ঈমানদারের অন্তর তার দিকে নিবিষ্ট করে দেন।---(কুরতুবী)

হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ (আ) যখন স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য সন্তান ইসমাঈল (আ)-কে আল্লাহ্র নির্দেশে মক্কার শুষ্ক পর্বতমালা বেষ্টিত মরুভূমিতে রেখে সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁদের জন্যও দোয়া করে বলেছিলেনঃ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ হে আল্লাহ্, আমার নিঃসঙ্গ পরিবার-পরিজনের প্রতি আপনি কিছু লোকের অন্তর আকৃষ্ট করে দিন। এ দোয়ার ফলেই হাজারো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এখনও মক্কা ও মক্কাবাসীদের প্রতি মহব্বতে সমগ্র বিশ্বের অন্তর আপ্লুত হচ্ছে। বিশ্বের প্রতি কোণ থেকে দূরতিক্রম্য বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে সারা জীবনের উপার্জন ব্যয় করে মানুষ এখানে পৌঁছে এবং বিশ্বের কোণে কোণে যেসব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হয়, তা মক্কার বাজারসমূহে পাওয়া যায়।

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ---বোধ্যগম্য নয়---এমন ক্ষীণতম শব্দকে رِكْز বলা হয়; যেমন মরণোন্মুখ ব্যক্তি জিহ্বা সঞ্চালন করলে আওয়াজ হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, সব রাজ্যাধিপতি, জাঁকজমকের অধিকারী ও শক্তিধরদেরকে যখন আল্লাহ্ তা'আলার আযাব পাকড়াও করে ধ্বংস করে দেয়, তখন এমন অবস্থা হয় যে, তাদের কোন ক্ষীণতম শব্দ এবং আচরণ-আলোড়ন আর শোনা যায় না।

সূরা তোয়া-হা

মক্কায় অবতীর্ণ, ১৩৫ আয়াত, ৮ রুকূ

এই সূরার অপর নাম সূরা কলীম-ও (كما ذكر السخاوى)। কারণ এতে হযরত মূসা কলীমুল্লাহ্ (আ)-র ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মসনদে দারেমীতে বর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রার বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করারও দুই হাজার বছর পূর্বে সূরা তোয়া-হা ও সূরা ইয়াসীন পাঠ করেন (অর্থাৎ ফেরেশ্তাদেরকে শোনান), তখন ফেরেশতারা বলেছিলেনঃ ঐ উম্মত অত্যন্ত ভাগ্যবান ও বরকতময়, যাদের প্রতি এই সূরাগুলো অবতীর্ণ হবে; ঐ বক্ষ পুণ্যবান, যারা এগুলো হিফ্য করবে এবং ঐ মুখ অপরিসীম সৌভাগ্যশালী, যারা এগুলো পাঠ করবে। এই বরকতময় সূরাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে আগমনকারী উমর ইবনুল খাত্তাবকে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল। সীরাত গ্রন্থাদিতে এ ঘটনা প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত।

ইবনে ইসহাক রেওয়ায়েত করেন, উমর ইবনে খাত্তাব একদিন খোলা তরবারি হস্তে মহানবী (সা)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হলেন। পথিমধ্যে নুআয়ম ইবনে আবদুল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ হলে সে জিজ্ঞেস করলঃ কোথায় যাচ্ছেন? উমর ইবনে খাত্তাব বললেনঃ আমি ঐ পথভ্রষ্ট ব্যক্তির জীবনলীলা সাঙ্গ করতে যাচ্ছি, যে কোরায়শদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, তাদের দীন ও মাযহাবের নিন্দা করে তাদেরকে বোকা ঠাওরিয়েছে এবং তাদের উপাস্য প্রতিমাদেরকে মন্দ বলেছে। নুআয়ম বললঃ উমর, তুমি মারাত্মক ধোঁকায় পতিত আছ। তুমি কি মনে কর যে, তুমি মুহাম্মদ (সা)-কে হত্যা করবে আর তার গোত্র বনী আবদে-মনাফ তোমাকে পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করার জন্য জীবিত ছেড়ে দেবে? তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে, তবে প্রথমে তোমার ভগিনী ও ভগ্নিপতির খবর নাও। তারা মুহাম্মদ (সা)-এর ধর্মের অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছে। কথাটি উমরের মনে দাগ কাটল। তিনি সেখান থেকেই ভগ্নিপতির বাড়ীর উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তাঁর গৃহে তখন সাহাবী খাব্বাব ইবনে আরত স্বামী-স্ত্রীকে সহীফায় লিখিত কোরআন পাকের সূরা তোয়া-হা পাঠ করাচ্ছিলেন।

উমর ইবনে খাত্তাবের আগমন টের পেয়ে হযরত খাব্বাব গৃহের এক কক্ষে অথবা কোণে আত্মগোপন করলেন। ভগিনী তাড়াতাড়ি সহীফাটি উরুর নিচে লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু তাতে কি হয়, উমরের কানে খাব্বাবের এবং তাদের তিলাওয়াতের আওয়াজ পড়ে গিয়েছিল। তাই তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই পড়া ও পড়ানোর আওয়াজ কিসের ছিল? ভগিনী (বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে বললেন ঃ) ও কিছু না। কিন্তু উমর ইবনে খাত্তাব আসল কথা ব্যক্ত করে বললেন ঃ আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা উভয়েই মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী মুসলমান হয়ে গেছ। একথা বলেই তিনি ভগ্নিপতি সাঈদ ইবনে যায়দের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে ভগিনী স্বামীকে উদ্ধার করার জন্য চেষ্টিত হলেন। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁকেও প্রহারের পর প্রহার করে দেহ রক্তাক্ত করে দিলেন।

ব্যাপার এতদূর গড়াতে দেখে ভগিনী ও ভগ্নিপতি উভয়েই একযোগে বলে উঠলেন ঃ শুনে নাও, আমরা নিশ্চিতই মুসলমান হয়ে গেছি এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। এখন তুমি যা করতে পার, কর। ভগিনীর ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছিল। এ অবস্থা দেখে উমর কিছুটা অনুতপ্ত হলেন এবং বোনকে বললেন ঃ সহীফাটি আমাকে দেখাও, যা তোমরা পড়ছিলে ; এতে মুহাম্মদ কি শিক্ষা নিয়ে এসেছেন, তা আমিও দেখি। উমর ইবনে খাত্তাব লেখাপড়া জানা ব্যক্তি ছিলেন, তাই সহীফা দেখার জন্য চাইলেন। ভগিনী বললেন ঃ আমরা আশংকা করি যে, সহীফাটি তোমার হাতে দিলে তুমি একে নষ্ট করে দেবে অথবা এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে। উমর ইবনে খাত্তাব তাঁর উপাস্য দেবদেবীর কসম খেয়ে বললেন ঃ তোমরা ভয় করো না, আমি সহীফাটি পড়ে তোমাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেব। ভগিনী ফাতিমা এই ভাবগতিক দেখে কিছুটা আশান্বিত হলেন যে, বোধ হয় উমরও মুসলমান হয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ ভাই, ব্যাপার এই যে, তুমি অপবিত্র। এই সহীফা পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ স্পর্শ করতে পারে না। যদি তুমি দেখতেই চাও, তবে গোসল করে নাও। উমর গোসল করলে সহীফা তাঁর হাতে দেওয়া হল। সহীফায় সূরা তোয়া-হা লিখিত ছিল। প্রথম অংশ পড়েই উমর বললেন ঃ এই কালাম তো খুবই উৎকৃষ্ট ও সম্মানার্হ। খাব্বাব ইবনে আরত গৃহে আত্মগোপনরত অবস্থায় এসব কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। উমরের এ বাক্য শুনেই তিনি সামনে এসে গেলেন এবং বললেন ঃ হে উমর ইবনে খাত্তাব, আল্লাহ্র রহমতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের দোয়ার ফলশ্রুতিতে তোমাকে মনোনীত করেছেন। গতকাল আমি প্রিয় নবী (সা)-কে এরূপ দোয়া করতে শুনেছি ঃ

اللهم ايد الاسلام بابى الحكم بن هشام او بعمر بن الخطاب

হে আল্লাহ্, হয় আবুল হাকাম ইবনে হিশাম (অর্থাৎ আবু জেহেল)-এর মাধ্যমে না হয় উমর ইবনে খাত্তাবের মাধ্যমে আপনি ইসলামকে শক্তি দান করুন। উদ্দেশ্য এই যে, এতদুভয়ের মধ্যে একজন মুসলমান হোক। এতে মুসলমানদের দলে নতুন প্রাণ ও নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হবে। অতঃপর খাব্বাব বললেন ঃ হে উমর, তুমি এই সুবর্ণ সুযোগ নষ্ট করো না। উমর বললেন ঃ আমাকে মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে নিয়ে চল। (কুরতুবী) এর পরবর্তী ঘটনা সবারই জানা।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

طٰهٰ ۝١ مَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰٓى ۝٢ اِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝٣
تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى ۝٤ اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوٰى ۝٥ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ۝٦
وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهٗ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى ۝٧ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۝٨

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(১) তোয়া-হা (২) আপনাকে ক্লেশ দেবার জন্যে আমি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিনি। (৩) কিন্তু তাদেরই উপদেশের জন্যে, যারা ভয় করে। (৪) এটা তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি পরম দয়াময়, আরশে সমাসীন হয়েছেন। (৬) নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং সিক্ত ভূগর্ভে যা আছে, তা তাঁরই। (৭) যদি তুমি উচ্চকণ্ঠেও কথা বল, তিনি তো গুপ্ত ও তদপেক্ষাও গুপ্ত বিষয়বস্তু জানেন। (৮) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য ইলাহ নেই। সব সৌন্দর্যমণ্ডিত নাম তাঁরই।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তোয়া-হা---(এর অর্থ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন)। আমি আপনার প্রতি কোর-আন (পাক) এজন্য অবতীর্ণ করিনি যে, আপনি কষ্ট করবেন; বরং এমন ব্যক্তির উপদেশের জন্য (অবতীর্ণ করেছি), যে (আল্লাহ্‌কে) ভয় করে। এটা তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে, যিনি ভূমণ্ডল ও সমুচ্চ নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন (এবং) তিনি পরম দয়াময়, আরশের ওপর (যা রাজসিংহাসনের অনুরূপ) সমাসীন (ও বিরাজমান) আছেন (যেভাবে তাঁর পক্ষে উপযুক্ত। তিনি এমন যে) তাঁরই মালিকানাধীন যা কিছু নভোমণ্ডলে, ভূমণ্ডলে, এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে আছে (অর্থাৎ আকাশের নিচে ও ভূমণ্ডলের ওপরে) এবং যা কিছু ভূগর্ভে আছে; (অর্থাৎ ভূগর্ভের সিক্ত মাটি, যাকে ثرٰی বলা হয়, তার নিচে যা আছে। উদ্দেশ্য এই যে ভূগর্ভের গভীরে যা কিছু আছে। এটা তো হল আল্লাহ্ তা'আলার শক্তি ও আধিপত্য।) আর (জ্ঞানের পরিধি এই যে) যদি তুমি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) চিৎকার করে কথা বল, তবে (তা শোনার ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ নেই-ই) তিনি (এমন যে) গোপনভাবে বলা কথা (বরং) তদপেক্ষাও গোপন কথা (অর্থাৎ

যা এখনও মনে মনে আছে) জানেন। (তিনি) আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁর খুব ভাল ভাল নাম আছে। এগুলো তাঁর গুণগরিমা বোঝায়। সুতরাং কোরআন এমন সর্বগুণে গুণান্বিত সত্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং নিশ্চিত সত্য।)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

طٰهٰ—এই শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর অর্থ يَا رَجُلُ (হে ব্যক্তি) এবং ইবনে উমর থেকে يَا حَبِيْبِىْ (হে আমার বন্ধু) বর্ণিত আছে। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, طٰهٰ ও يٰسٓ রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অন্যতম নাম। কিন্তু হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ও বিশিষ্ট আলিমগণ এ সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন, তাই নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য। তাঁরা বলেন ঃ কোরআন পাকের অনেক সূরার শুরুতে الٓمٓ এর ন্যায় বেশ কিছু সংখ্যক খণ্ড অক্ষর উল্লিখিত হয়েছে। এগুলো متشابهات অর্থাৎ গোপন ভেদ, যার মর্ম আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কেউ জানে না। طٰهٰ শব্দটিও এরই অন্তর্ভুক্ত।

مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰى — لِتَشْقٰى শব্দটি شَقَاءٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ ক্লেশ, পরিশ্রম ও কষ্ট। কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম সারারাত ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকতেন এবং তাহাজ্জুদের নামাযে কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকতেন। ফলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পা ফুলে যায়। কাফিররা কোন রকমে হিদায়ত লাভ করুক এবং কোরআনের দাওয়াত কবূল করুক তিনি সারাদিন এ চিন্তায়ই কাটিয়ে দিতেন। আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই উভয়বিধ ক্লেশ থেকে উদ্ধার করার জন্য বলা হয়েছে ঃ আপনাকে কষ্টে ও পরিশ্রমে ফেলার জন্য আমি কোরআন অবতীর্ণ করি নি। সারারাত জাগ্রত থাকা এবং কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার প্রয়োজন নেই। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা) নিয়মিতভাবে রাতের সূচনাভাগে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদ পড়তেন।

এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু দাওয়াত ও প্রচার করা। একাজ সম্পন্ন করার পর কে বিশ্বাস স্থাপন করল এবং কে দাওয়াত কবূল করল না, তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা আপনার দায়িত্ব নয়। —(কুরতুবী—সংক্ষেপিত)

إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ—ইবনে কাসীর বলেনঃ কোরআন অবতরণের সূচনাভাগে সারারাত তাহাজ্জুদ ও কোরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকার কারণে কোন কোন কাফির মুসলমানদের প্রতি বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে থাকে যে, তাদের প্রতি কোরআন তো নয়---সাক্ষাৎ বিপদ নাযিল হয়েছে; রাতেও আরাম নেই, দিনের বেলায়ও শান্তি নেই। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইঙ্গিত করেছেন যে, সত্য সম্পর্কে বেখবর; হতভাগা, মূর্খরা জানে না যে, কোরআন ও কোরআনের মাধ্যমে প্রদত্ত আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান মঙ্গলই মঙ্গল এবং সৌভাগ্যই সৌভাগ্য। যারা একে বিপদ মনে করে, তারা বেখবর ও নির্বোধ। হযরত মুআবিয়ার বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যার মঙ্গল করার ইচ্ছা করেন, তাকে ধর্মের জ্ঞান ও বুৎপত্তি দান করেন।

এখানে ইবনে কাসীর অপর একটি সহীহ্ হাদীসও উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি আলিম সমাজের জন্য খুবই সুসংবাদবহ। এই হাদীসটি হযরত সা'লাবা কর্তৃক ইবনে-হাকাম থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি এইঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله للعلماء يوم القيامة اذا قعد على كرسيه لقضاء عباده انى لم اجعل علمى و حكمتى فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم و لا ابالى -

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাদের আমলের ফয়সালা করার জন্যে তাঁর সিংহাসনে উপবেশন করবেন, তখন আলিমগণকে বলবেনঃ আমি আমার ইল্‌ম ও হিকমত তোমাদের বুকে এজন্যেই রেখেছিলাম, যাতে তোমাদের কৃত গোনাহ্ ও ত্রুটি সত্ত্বেও তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেই। এতে আমি কোন পরওয়া করি না।'

কিন্তু এখানে সেসব আলিমগণকেই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে কোরআন বর্ণিত ইল্‌মের লক্ষণ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় বিদ্যমান আছে। আয়াতের لِّمَن يَخْشَىٰ শব্দটি এদিকে ইঙ্গিত করে। যাদের মধ্যে এই আলামত নেই, তারা এই হাদীসের যোগ্যপাত্র নয়। والله اعلم

اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ—استواء على العرش (আরশের ওপর সমাসীন হওয়া) সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও নির্ভুল উক্তি সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীগণের থেকে এরূপ

বর্ণিত আছে যে, এর স্বরূপ ও অবস্থা কারও জানা নেই। এটা متشابهات তথা দুর্বোধ্য বিষয়াদির অন্যতম। এরূপ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরশের ওপর সমাসীন হওয়া সত্য। এ অবস্থা আল্লাহ্‌র শান অনুযায়ী হবে। জগতের কেউ তা উপলব্ধি করতে পারে না।

وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى—আর্দ্র ও ভেজা মাটিকে ثَرٰى বলা হয়, যা মাটি খনন করার সময় নীচ থেকে বের হয়। মানুষের জ্ঞান এই ثَرٰى পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যায়। এর নীচে কি আছে, তা আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানে না। সমকালীন নতুন গবেষণা নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সত্ত্বেও মাটি খুঁড়ে এপার থেকে ওপারে চলে যাওয়ার প্রচেষ্টা বহু বছর ধরে চালানো হয়েছে এবং এসব গবেষণা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলাফল পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে; কিন্তু মাত্র ছয় মাইল গভীর পর্যন্তই এসব আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজ করতে সক্ষম হয়েছে! এর নীচে এমন প্রস্তর সদৃশ স্তর রয়েছে, যেখানে খনন কাজ চালাতে সকল যন্ত্রপাতি ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনাও ব্যর্থ হয়েছে। মাত্র ছয় মাইলের গভীরতা পর্যন্তই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে; অথচ মৃত্তিকার ব্যাস হাজারো মাইল। তাই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই যে, পাতালের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই বিশেষ গুণ।

يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى—মানুষ মনে যে কথা গোপন রাখে, কারও কাছে তা প্রকাশ করে না, তাকে বলা হয় سر পক্ষান্তরে اخفى বলে সে কথা বোঝানো হয়েছে, যা এখন পর্যন্ত মনেও আসেনি, ভবিষ্যতে কোন সময় আসবে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব বিষয় সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। কোন মানুষের মনে এখন কি আছে এবং ভবিষ্যতে কি থাকবে, তিনি সবই জানেন। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিও জানে না যে, আগামীকাল তার মনে কি কথা উদিত হবে।

وَهَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۝ اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لِاَهْلِهِ امْكُثُوْٓا اِنِّيْٓ اٰنَسْتُ
نَارًا لَّعَلِّيْٓ اٰتِيْكُمْ مِّنْهَا بِقَبَسٍ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّآ اَتٰىهَا
نُوْدِيَ يٰمُوْسٰٓى ۝ اِنِّيْٓ اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۚ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ
طُوًى ۝ وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوْحٰٓى ۝ اِنَّنِيْٓ اَنَا اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ
اَنَا فَاعْبُدْنِيْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ اَكَادُ اُخْفِيْهَا

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا
وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَتَرْدٰى ﴿١٦﴾

(৯) আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে, কি? (১০) তিনি যখন আগুন দেখলেন তখন পরিবারবর্গকে বললেন ঃ তোমরা এখানে অবস্থান কর আমি আগুন দেখেছি। সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন জ্বালিয়ে আনতে পারব অথবা আগুনে পৌঁছে পথের সন্ধান পাব। (১১) অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন আওয়াজ আসল, হে মূসা, (১২) আমিই তোমার পালনকর্তা, অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল, তুমি পবিত্র উপত্যকা তোয়ায় রয়েছ। (১৩) এবং আমি তোমাকে মনোনীত করেছি, অতএব যা প্রত্যাদেশ করা হচ্ছে, তা শুনতে থাক। (১৪) আমিই আল্লাহ্ আমা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম কর। (১৫) কিয়ামত অবশ্যই আসবে, আমি তা গোপন রাখতে চাই ; যাতে প্রত্যেকেই তার কর্মানুযায়ী ফল লাভ করে। (১৬) সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে নিবৃত্ত না করে। নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[হে মুহাম্মদ (সা)] আপনার কাছে মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? (অর্থাৎ তা শ্রবণযোগ্য ; কেননা তাতে তওহীদ ও নবুয়ত সম্পর্কিত জ্ঞান নিহিত আছে। সেগুলো প্রচার করলে উপকার হবে। বৃত্তান্ত এই ঃ) যখন তিনি (মাদইয়ান থেকে ফেরার পথে এক প্রবল শীতের রাতে পথ ভুলে তূর পর্বতের ওপর) আগুন দেখলেন (বাস্তবে সেটা ছিল আগুনের আকারে নূর), তখন তিনি পরিবারবর্গকে (পরিবার বলতে একমাত্র স্ত্রী ছিল অথবা খাদিম ইত্যাদিও ছিল) বললেন ঃ তোমরা (এখানেই) অবস্থান কর (অর্থাৎ আমার পেছনে পেছনে এসো না। কেননা পরিবারবর্গকে ছেড়ে তিনি চলে যাবেন—এরূপ সম্ভাবনাই ছিল না।) আমি একটি আগুন দেখেছি। (আমি সেখানে যাচ্ছি) সম্ভবত আমি তা থেকে তোমাদের কাছে কিছু আগুন (লাকড়ী ইত্যাদিতে লাগিয়ে) আনতে পারব (যাতে শীতের প্রতিকার হয়) অথবা (সেখানে) আগুনের কাছে পৌঁছে পথের সন্ধান (জানে, এমন ব্যক্তিও) পাব। অতঃপর যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন, তখন (আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাঁকে) আওয়াজ দেওয়া হল, হে মূসা, আমি তোমার পালনকর্তা। অতএব তুমি জুতা খুলে ফেল। (কেননা,) তুমি পবিত্র "তোয়া" উপত্যকায় আছ। (এটা সে উপত্যকার নাম।) আমি তোমাকে (নবী করার জন্য সব মানুষের মধ্য থেকে) মনোনীত করেছি। অতএব (এখন) যা ওহী করা হচ্ছে, তা (মনোযোগ দিয়ে) শুনতে থাক। (তা এই যে) আমি আল্লাহ্। আমা ব্যতীত কোন উপাস্য (হওয়ার যোগ্য) নেই। অতএব আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে নামায পড়। (আরও শুন যে) কিয়ামত অবশ্যই

আসবে। আমি তা (সৃষ্টজগতের কাছে) গোপন রাখতে চাই---(কিয়ামত আসার কারণ এই যে) যাতে প্রত্যেকেই তার কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। (কিয়ামতের আগমন যখন নিশ্চিত, তখন যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস রাখে না এবং নিজ খাহেশের অনুসরণ করে, সে যেন তোমাকে তা থেকে (অর্থাৎ কিয়ামতের জন্য প্রস্তুত থাকতে) বিরত না রাখে (অর্থাৎ তুমি এরূপ ব্যক্তির প্রভাবাধীন হয়ে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নিবৃত্ত হয়ো না।) তা হলে তুমি (এই নিবৃত্তির কারণে) ধ্বংস হয়ে যাবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى---পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কোরআন পাকের মাহাত্ম্য এবং সেই প্রসঙ্গে রসূলের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। এরপর আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত মূসা (আ)-র কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বিষয়বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক এই যে, রিসালত ও দাওয়াতের কর্তব্য পালনের পথে যে সব বিপদাপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় এবং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ যে সব কষ্ট সহ্য করেছেন, সেগুলো মহানবী (সা)-র জানা থাকা দরকার যাতে তিনি পূর্ব থেকেই এ সব বিপদাপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অবিচল থাকতে পারেন। যেমন অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ

অর্থাৎ আমি পয়গম্বরগণের এমন কাহিনী আপনার কাছে এ জন্য বর্ণনা করি, যাতে আপনার অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং আপনি নবুয়তের দায়িত্ব বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এখানে উল্লিখিত মূসা (আ)-র কাহিনীর সূচনা এভাবে যে, একদা তিনি মাদইয়ান পৌঁছে হযরত শুআয়ব (আ)-এর গৃহে এরূপ চুক্তির অধীনে অবস্থান করতে থাকেন যে, আট অথবা দশ বছর পর্যন্ত তাঁর খিদমত করবেন। তফসীর বাহ্‌রে-মুহীতের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি যখন উচ্চ মেয়াদ অর্থাৎ দশ বছর পূর্ণ করেন তখন শুআয়ব (আ)-এর কাছে আরয করলেন ঃ এখন আমি জননী ও ভগ্নির সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মিসর যেতে চাই। ফিরাউনের সিপাহীরা তাঁকে গ্রেফতার ও হত্যার জন্য খোঁজ করছিল। এ আশংকার কারণেই তিনি মিসর ত্যাগ করেছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার ফলে এখন সে আশংকা বাকী ছিল না। শুআয়ব (আ) তাঁকে স্ত্রী অর্থাৎ নিজের কন্যাসহ কিছু অর্থকড়ি ও আসবাবপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। পথিমধ্যে সিরিয়ার শাসকদের পক্ষ থেকে বিপদাশংকা ছিল, তাই তিনি সাধারণ পথ ছেড়ে অখ্যাত পথ অবলম্বন করলেন। তখন ছিল শীতকাল। স্ত্রী ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর প্রসবকাল ছিল নিকটবর্তী। সকাল-বিকাল যে কোন সময় প্রসবের সম্ভাবনা ছিল। রাস্তা ছিল অপরিচিত। তাই তিনি জঙ্গলের পথ হারিয়ে তূর পর্বতের পশ্চিমে ও ডানদিকে চলে গেলেন। গভীর অন্ধকার। কনকনে শীত।

বরফসিক্ত মাটি। এহেন দুর্যোগ-মুহূর্তে স্ত্রীর প্রসববেদনা শুরু হয়ে গেল। মূসা (আ) শীতের কবল থেকে আত্মরক্ষার্থে আগুন জ্বালাতে চাইলেন। তখনকার দিনে দিয়াশলাই-এর স্থলে চকমাকি পাথর ব্যবহার করা হত। এই পাথরে আঘাত করলে আগুন জ্বলে ওঠত। মূসা (আ) এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যর্থ হলেন। আগুন জ্বলল না। এই হতবুদ্ধি অবস্থার মধ্যেই তিনি তূর পর্বতে আগুন দেখতে পেলেন। সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে নূর। তিনি পরিবারবর্গকে বললেনঃ তোমরা এখানেই অবস্থান কর। আমি আগুন দেখেছি। দেখি, সেখানে গিয়ে আগুন আনা যায় কিনা। সম্ভবত আগুনের কাছে কোন পথপ্রদর্শক ব্যক্তিও পেতে পারি, যার কাছ থেকে পথের সন্ধান জানতে পারব। পরিবার-বর্গের মধ্যে স্ত্রী যে ছিলেন, তা তো সুনিশ্চিত। কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কোন খাদেমও সাথে ছিল। তাকে উদ্দেশ্য করেও সম্বোধন করা হয়েছে। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, কিছুসংখ্যক লোক সফর-সঙ্গীও ছিল; কিন্তু পথ ভুলে তিনি তাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।---(বাহ্‌রে মুহীত)

فَلَمَّا أَتَاهَا—অর্থাৎ যখন তিনি আগুনের কাছে পৌঁছলেন; মসনদ আহ্‌মদে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ বর্ণনা করেন যে, মূসা (আ) আগুনের কাছে পৌঁছে একটি বিস্ময়কর দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, এটি একটি বিরাট আগুন, যা একটি সতেজ ও সবুজ বৃক্ষের ওপর দাউ দাউ করে জ্বলছে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এর কারণে বৃক্ষের কোন ডাল অথবা পাতা পুড়ছে না; বরং আগুনের কারণে বৃক্ষের সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঔজ্জ্বল্য আরও বেড়ে গেছে। মূসা (আ) এই বিস্ময়কর দৃশ্য কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন এবং অপেক্ষা করলেন যে, আগুনের কোন স্ফুলিঙ্গ মাটিতে পড়লে তিনি তা তুলে নেবেন। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পরও যখন এমন হল না, তখন তিনি কিছু ঘাস ও খড়কুটা একত্রিত করে আগুনের কাছে ধরলেন। বলা বাহুল্য, এতে আগুন লেগে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। কিন্তু এগুলো আগুনের কাছে নিতেই আগুন পেছনে সরে গেল। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, আগুন তাঁর দিকে অগ্রসর হল। তিনি অস্থির হয়ে পেছনে সরে গেলেন। মোটকথা, আগুন লাভ করার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। তিনি এই অত্যাশ্চর্য আগুনের প্রভাবে বিস্ময়াভিভূত ছিলেন, ইতিমধ্যে একটি গায়েবী আওয়াজ হল। (রূহুল মা'আনী) মূসা (আ) পাহাড়ের পাদদেশে এই ঘটনার সম্মুখীন হন। পাহাড়টি ছিল তাঁর ডানদিকে। এই উপত্যকার নাম ছিল 'তোয়া'।

نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ—বাহ্‌রে মুহীত, রূহুল মা'আনী ইত্যাদি গ্রন্থে আছে, হযরত মূসা (আ) এই আওয়াজ চতুর্দিক থেকে সমভাবে শ্রবণ করেন। তার কোন দিক নির্দিষ্ট ছিল না। শুনেছেনও অপরূপ ভঙ্গিতে; শুধু কানে নয়, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। এটা ছিল একটা মু'জিযার মতই। আওয়াজের সারমর্ম ছিল এই যে, যে বস্তুকে তুমি আগুন মনে করছ, তা আগুন নয়---আল্লাহ্ তা'আলার দ্যুতি। এতে বলা হয়, আমিই তোমার পালনকর্তা। হযরত মূসা (আ)

কিরূপে নিশ্চিত হলেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই আওয়াজ? এই প্রশ্নের আসল উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অন্তরে এ বিষয়ে স্থির বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলারই আওয়াজ। এ ছাড়া মূসা (আ) দেখলেন যে, এই আগুনের কারণে বৃক্ষ পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে তার সৌন্দর্য, সজীবতা ও ঐজ্জ্বল্য আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আওয়াজও সাধারণ মানুষের আওয়াজের ন্যায় একদিক থেকে আসে নি; বরং চতুর্দিক থেকে এসেছে এবং শুধু কানই নয়---হাত, পা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও এ আওয়াজ শ্রবণে শরীক আছে; এসব অবস্থা থেকেও তিনি বুঝে নেন যে, এ আওয়াজ আল্লাহ্ তা'আলারই!

মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার শব্দযুক্ত কালাম প্রত্যক্ষভাবে শ্রবণ করেছেন: রূহুল-মা'আনীতে মসনদ আহমদের বরাতে ওয়াহাবের রেওয়ায়েত বর্ণিত রয়েছে যে, মূসা (আ)-কে যখন 'ইয়া মূসা' শব্দ প্রয়োগে আওয়াজ দেয়া হয়, তখন তিনি 'লাব্বায়েক' (হাজির আছি) বলে জওয়াব দেন এবং বলেন যে, আমি আওয়াজ শুনছি। কিন্তু কোথা থেকে আওয়াজ দিচ্ছেন, তা জানি না। আপনি কোথায় আছেন? উত্তরে বলা হল: আমি তোমার ওপরে, সামনে, পশ্চাতে ও তোমার সাথে আছি। অতঃপর মূসা (আ) আরয করলেন: আমি স্বয়ং আপনার কালাম শুনছি, না আপনার প্রেরিত কোন ফেরেশ্তার কথা শুনছি? জওয়াব হল: আমি নিজেই তোমার সাথে কথা বলছি। রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন: এ থেকে জানা যায় যে, মূসা (আ) এই শব্দযুক্ত কালাম ফেরেশ্তাদের মধ্যস্থতা ব্যতীত নিজে শুনেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল-জামাআতের মধ্যে একদল আলিম এজন্যেই বলেন যে, শব্দযুক্ত কালামও চিরন্তন হওয়া সত্ত্বেও শ্রবণযোগ্য। এর কালাম নবীন হয় বলে যে প্রশ্ন তোলা হয়, তার জওয়াব তাদের পক্ষ থেকে এই যে, শব্দযুক্ত কালাম তখনই নবীন হয়, যখন তা বৈষয়িক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। এরজন্যে স্থূলতা ও দিক শর্ত। এরূপ কালাম বিশেষভাবে কানেই শোনা যায়। মূসা (আ) কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে এ কালাম শোনেন নি এবং শুধু কানেই শোনেন নি, বরং সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা শুনেছেন। বলা বাহুল্য, এ পরিস্থিতি নবীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে মুক্ত।

সম্ভ্রমের স্থানে জুতা খুলে ফেলা অন্যতম আদব: فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ জুতা খোলার নির্দেশ দেয়ার এক কারণ এই যে, স্থানটি ছিল সম্ভ্রম প্রদর্শনের এবং জুতা খুলে ফেলা তার অন্যতম আদব। দ্বিতীয় কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়ায়েত থেকে জানা যায়, মূসা (আ)-র পাদুকাদ্বয় ছিল মৃত জন্তুর চর্মনির্মিত। হযরত আলী, হাসান বসরী ও ইবনে জুরায়জ থেকে প্রথমোক্ত কারণই বর্ণিত আছে। তাদের মতে মূসা (আ)-র পদদ্বয় এই পবিত্র উপত্যকার মাটি স্পর্শ করে বরকত হাসিল করুক---এটাই ছিল জুতা খুলে রাখার উপকারিতা। কেউ কেউ বলেন: বিনয় ও নম্রতার আকৃতি ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই নির্দেশ দেয়া হয়, যেমন পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করার সময় এরূপ করতেন।

হাদীসে রয়েছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বশীর ইবনে খাসাসিয়াকে কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটতে দেখে বলেছিলেন ঃ اذا كنت فى مثل هذا المكان فاخلع نعليك—অর্থাৎ তুমি যখন এ জাতীয় সম্মানযোগ্য স্থান অতিক্রম কর, তখন জুতা খুলে নাও।

জুতা পাক হলে তা পরিধান করে নামায পড়া সব ফিকাহ্‌বিদের মতে জায়েয। রসূলুল্লাহ্ (স) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে পাকজুতা পরিধান করে নামায পড়া প্রমাণিতও রয়েছে; কিন্তু সাধারণ সুন্নত এরূপ প্রতীয়মান হয় যে, জুতা খুলে নামায পড়া হত। কারণ এটাই বিনয় ও নম্রতার নিকটবর্তী।—(কুরতুবী)

انك بالواد المقدس طوى—আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীর বিশেষ বিশেষ অংশকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ও সম্মান দান করেছেন; যেমন বায়তুল্লাহ্, মজজিদে-আকসা ও মসজিদে-নববী। তোয়া উপত্যকাও তেমনি পবিত্র স্থানসমূহের অন্যতম। এটা তূর পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত।—(কুরতুবী)

কোরআন শ্রবণের আদব ঃ فاستمع لما يوحى—ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে, কোরআন শ্রবণ করার আদব এই যে, সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাজে কার্যকলাপ থেকে নিবৃত্ত রাখতে হবে, কোন অন্য কাজে ব্যাপৃত হবে না, দৃষ্টি নিম্নগামী রাখবে এবং কালাম বোঝার প্রতি মনোনিবেশ করবে। যে ব্যক্তি এরূপ আদবসহকারে কালাম শ্রবণ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তা বোঝারও তওফীক দান করেন।—(কুরতুবী)

انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلوة لذكري—এই কালামে হযরত মূসা (আ)-কে ধর্মের সমুদয় মূলনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; অর্থাৎ তওহীদ, রিসালত ও পরকাল। فاستمع لما يوحى বলে রিসালতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। فاعبدني এর অর্থ শুধু আমার ইবাদত কর—আমা ব্যতীত কারও ইবাদত করো না। এটা তওহীদের বিষয়বস্তু। অতঃপর ان الساعة اتية—বলে পরকাল বর্ণনা করা হয়েছে। فاعبدني—এই নির্দেশে নামাযের কথাও রয়েছে;

কিন্তু নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, নামায সমস্ত ইবাদতের সেরা ইবাদত। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী নামায ধর্মের স্তম্ভ, ঈমানের নূর এবং নামায বর্জন কাফিরদের আলামত।

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ—উদ্দেশ্য এই যে, নামাযের প্রাণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র স্মরণ। নামায আদ্যোপান্ত যিকরই যিকর—মুখে অন্তঃকরণে এবং সর্বাঙ্গে যিকর। তাই নামাযে যিকর তথা আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে গাফিল হওয়া উচিত নয়। কোন কোন হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী لِذِكْرِىْ শব্দের এক অর্থ এরূপও যে, কারও নিদ্রাভঙ্গ না হলে অথবা কোন কাজে ব্যাপৃত থাকার দরুন নামাযের কথা ভুলে গেলে এবং নামাযের সময় চলে গেলে যখনই নিদ্রাভঙ্গ হয় অথবা নামাযের কথা স্মরণ হয়, তখনই নামায পড়ে নিতে হবে।

أَكَادُ أُخْفِيْهَا—অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারটি আমি সব সৃষ্টজীবের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাই; এমন কি পয়গম্বর ও ফেরেশ্‌তাদের কাছ থেকেও। أَكَادُ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কিয়ামত ও পরকালের ভাবনা দিয়ে মানুষকে ঈমান ও সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য না হলে আমি কিয়ামত আসবে—একথাও প্রকাশ করতাম না।

لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعٰى—(যাতে প্রত্যেককে তার কর্মানুযায়ী ফল দেওয়া যায়।) এই বাক্যটি أٰتِيَةٌ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলে অর্থ সুস্পষ্ট যে, এখানে কিয়ামত আগমনের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। রহস্য এই যে, দুনিয়া প্রতিদানের স্থান নয়! এখানে কেউ সৎ ও অসৎ কর্মের ফল লাভ করে না। কেউ কিছু ফল পেলেও তা তার কর্মের সম্পূর্ণ ফল লাভ নয়—একটি নমুনা হয় মাত্র। তাই এমন দিন-ক্ষণ আসা অপরিহার্য, যখন প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কর্মের প্রতিদান ও শাস্তি পুরাপুরি দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাক্যটি أَكَادُ أُخْفِيْهَا এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে অর্থ এই যে, এখানে কিয়ামত ও মৃত্যুর সময়-তারিখ গোপন রাখার রহস্য বর্ণিত হয়েছে। রহস্য এই যে, মানুষ কর্ম ও প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকুক এবং ব্যক্তিগত কিয়ামত অর্থাৎ মৃত্যু ও বিশ্বজনীন কিয়ামত অর্থাৎ হাশরের দিনকে দূরে মনে করে গাফিল না হোক। (রূহুল-মা'আনী)

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا---এতে হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে সতর্ক করা হয়েছে যে, তুমি কাফির ও বেঈমানদের কথায় কিয়ামত সম্পর্কে অসাবধানতার পথ বেছে নিয়ো না। তা'হলে তা তোমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, নবী ও পয়গম্বরগণ নিষ্পাপ হয়ে থাকেন। তাঁদের তরফ থেকে এরূপ অসাবধানতার আশংকা নেই। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ)-কে এরূপ বলার আসল উদ্দেশ্য তাঁর উম্মত ও সাধারণ মানুষকে শোনানো। এতে তারা বুঝবে যে, আল্লাহ্‌র পয়গম্বরগণকেও যখন এমনভাবে তাকীদ করা হয়, তখন এ ব্যাপারে আমাদের কতটুকু যত্নবান হতে হবে।

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا
عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ ﴿١٩﴾ فَأَلْقَاهَا
فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿٢٠﴾ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۖ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا
الْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً
أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾

---

(১৭) হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি? (১৮) তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দেই এবং এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (১৯) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি ওটা নিক্ষেপ কর। (২০) অতঃপর তিনি তা নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। (২১) আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি তাকে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২২) তোমার হাত বগলে রাখ, তা বের হয়ে আসবে নির্মল উজ্জ্বল হয়ে অন্য এক নিদর্শনরূপে; কোন দোষ ছাড়াই। (২৩) এটা এজন্যে যে, আমি আমার বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (২৪) ফিরাউনের নিকট যাও, সে দারুণ উদ্ধত হয়ে গেছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে আরও বললেন ঃ] হে মূসা, তোমার ডান হাতে ওটা কি? তিনি বললেন ঃ এটা আমার লাঠি, আমি (কোন সময়) এর উপর ভর দেই এবং (কোন সময়)-এর দ্বারা আমার ছাগপালের জন্য (বৃক্ষের) পাতা ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (উদাহরণত কাঁধে রেখে আসবাবপত্র ঝুলিয়ে

নেওয়া, এর সাহায্যে ইতর প্রাণীদেরকে সরিয়ে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি)। আল্লাহ্ বললেন ঃ একে (অর্থাৎ লাঠিকে) মাটিতে নিক্ষেপ কর হে মূসা। অতঃপর তিনি তা (মাটিতে) নিক্ষেপ করলেন, অমনি তা (আল্লাহ্র কুদরতে) একটি সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। [এতে মূসা (আ) ভীত হয়ে পড়লেন]। আল্লাহ্ বললেন ঃ তুমি একে ধর এবং ভয় করো না, আমি এখনি (অর্থাৎ ধরতেই) একে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব (অর্থাৎ এটা আবার লাঠি হয়ে যাবে এবং তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। এ হচ্ছে এক মু'জিযা।) এবং (দ্বিতীয় মু'জিযা এই দেওয়া হচ্ছে যে) তুমি তোমার (ডান) হাত (বাম) বগলে রাখ (এরপর বের কর) সেটা নির্দোষ (অর্থাৎ কোন ধ্বলকুষ্ঠ ইত্যাদি রোগ ছাড়াই) উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে (আমার কুদরত ও তোমার নবুয়তের) অন্য এক নিদর্শন-রূপে। (লাঠি নিক্ষেপ করা ও হাত বগলে দেওয়ার নির্দেশ এজন্য) যাতে আমি আমার (কুদরতের) বিরাট নিদর্শনাবলীর কিছু তোমাকে দেখাই। (অতএব এখন এসব নিদর্শন নিয়ে) ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব সীমালঙ্ঘন করেছে---(খোদায়ী দাবি করে। তুমি তার কাছে তওহীদ প্রচার কর। তোমার নবুয়তে সন্দেহ করলে এসব মু'জিযা দেখিয়ে দাও)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ---তোমার হাতে ওটা কি ?---আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মূসা (আ)-কে এরূপ জিজ্ঞাসা করা নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতি কৃপা, অনুকম্পা ও মেহেরবানীর সূচনা ছিল, যাতে বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখা ও আল্লাহ্র কালাম শোনার কারণে তাঁর মনে যে ভয়ভীতি ও আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর হয়ে যায়। এটা ছিল একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সম্বোধন। এ ছাড়া এই প্রশ্নের আরও একটি রহস্য এই যে, পরক্ষণেই তাঁর হাতের লাঠিকে একটি সাপ বা অজগরে রূপান্তরিত করা উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমার হাতে কি আছে দেখে নাও। তিনি যখন দেখে নিলেন যে, সেটা কাঠের লাঠি মাত্র, তখন একে সাপে রূপান্তরিত করার মু'জিযা প্রদর্শন করা হল। নতুবা মূসা (আ)-র মনে এরূপ ধারণার সম্ভাবনাও থাকতে পারত যে, আমি বোধ হয় রাতের অন্ধকারে লাঠির স্থলে সাপই ধরে এনেছি।

قَالَ هِيَ عَصَايَ---মূসা (আ)-কে শুধু এতটুকু প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, হাতে কি? এর জওয়াবে লাঠি বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মূসা (আ) এখানে আসল জওয়াবের অতিরিক্ত আরও তিনটি বিষয় আরয করেছেন। এক এই লাঠি আমার, দুই. আমি একে অনেক কাজে লাগাই; প্রথমত এর উপর ভর দেই; দ্বিতীয়ত এর দ্বারা আঘাত করে আমার ছাগপালের জন্য বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং তিন. এর দ্বারা আমার অন্যান্য কাজও উদ্ধার হয়। এই দীর্ঘ ও বিস্তারিত জওয়াবে ইশ্ক ও মহব্বত এবং পরিপূর্ণ আদবের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। ইশ্ক ও মহব্বতের দাবি এই যে, প্রেমাস্পদ

যখন অনুকম্পাবশত মনোযোগ দান করেছেন, তখন বক্তব্য দীর্ঘ করা উচিত, যাতে এই সুযোগ দ্বারা অধিকতর উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু সাথে সাথে আদবের দাবি এই যে, সীমাতিরিক্ত নিঃসঙ্কোচ হয়ে বক্তব্য অধিক দীর্ঘও না হওয়া চাই। এই দ্বিতীয় দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে উপসংহারে সংক্ষেপে বলেছেন وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى ---অর্থাৎ আমি এর দ্বারা আরও অনেক কাজ নেই। এরপর তিনি সেইসব কাজের বিস্তারিত বিবরণ দেননি।---(রূহুল-মা'আনী, মাযহারী)

তফসীর কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে এরূপ মাস'আলা বের করা হয়েছে যে, প্রয়োজন ও উপযোগিতার কারণে প্রশ্নে যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়নি, জওয়াবে তাও বর্ণনা করে দেওয়া জায়েয।

মাস'আলা ঃ এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, হাতে লাঠি রাখা পয়গম্বরগণের সুন্নত। রসূলুল্লাহ্ (সা)-রও এই সুন্নত ছিল। এতে অসংখ্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উপকার নিহিত আছে।---(কুরতুবী)

فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ---হযরত মূসা (আ)-র হাতের লাঠি আল্লাহ্র নির্দেশে নিক্ষেপ করার পর তা সাপে পরিণত হয়। এই সাপ সম্পর্কে কোরআন পাকের এক জায়গায় বলা হয়েছে, كَأَنَّهَا جَانٌّ ---আরবী অভিধানে ছোট ও সরু সাপকে جَانٌّ বলা হয়। অন্য জায়গায় বলা হয়েছে, فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ ---অজগর ও বৃহৎ মোটা সাপকে ثُعْبَانٌ বলা হয়। আলোচ্য আয়াতে حَيَّةٌ বলা হয়েছে। এটা ব্যাপক শব্দ, প্রত্যেক ছোট, বড় ও মোটা সরু সাপকে حَيَّةٌ বলা হয়। এসব আয়াতের পারস্পরিক বিরোধ নিরসন এভাবে সম্ভবপর যে, সাপটি শুরুতে সরু ও ছোট ছিল, এরপর মোটা ও বড় হয়ে যায় অথবা সাপ তো বড় ও অজগরই ছিল ; কিন্তু বড় সাপ স্বভাবতই দ্রুতগতিসম্পন্ন হয় না। কিন্তু মূসা (আ)-র এই অজগরটি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতে খুব দ্রুত চলত। তাই দ্রুতগতির দিক দিয়ে একে جَانٌّ অর্থাৎ হালকা ছোট সাপ বলা হয়েছে। আয়াতে كَأَنَّهَا শব্দটি দ্বারা এর প্রতি ইঙ্গিতও হতে পারে। কারণ, এ শব্দটি তুলনার অর্থ দেয়। একটি বিশেষ গুণ অর্থাৎ দ্রুতগতিসম্পন্ন হওয়ার দিক দিয়ে এই অজগরকে جَانٌّ এর সাথে তুলনা করা হয়েছে।---(মাযহারী)

وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ جَنَاحٌ আসলে জন্তুর পাখাকে বলা হয়।

এখানে নিজের বাহুতে অর্থাৎ বগলের নিচে হাত রেখে যখন বের করবে, তখন তা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকবে। হযরত ইবনে-আব্বাস থেকে تَخْرُجْ بَيْضَاءَ এর এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।---(মাযহারী)

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ---স্বীয় রসূলকে দু'টি বিরাট মু'জিযার অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত করার পর আদেশ করা হয়েছে যে, এখন উদ্ধত ফিরাউনকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়ার জন্য চলে যাও।

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٢٦﴾ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ
لِّسَانِيْ ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ ﴿٢٨﴾ وَاجْعَلْ لِّيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ﴿٢٩﴾ هٰرُوْنَ
اَخِيْ ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهٖٓ اَزْرِيْ ﴿٣١﴾ وَاَشْرِكْهُ فِيْٓ اَمْرِيْ ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ
كَثِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ﴿٣٤﴾ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ﴿٣٥﴾ قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ
سُؤْلَكَ يٰمُوْسٰى ﴿٣٦﴾

(২৫) মূসা বললেন ঃ হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন। (২৬) এবং আমার কাজ সহজ করে দিন। (২৭) এবং আমার জিহবা থেকে জড়তা দূর করে দিন, (২৮) যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার একজন সাহায্যকারী করে দিন--(৩০) আমার ভাই হারূনকে। (৩১) তার মাধ্যমে আমার কোমর মজবুত করুন (৩২) এবং তাকে আমার কাজে অংশীদার করুন (৩৩) যাতে আমরা বেশি করে আপনার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে পারি। (৩৪) এবং বেশি পরিমাণে আপনাকে স্মরণ করতে পারি। (৩৫) আপনি তো আমাদের অবস্থা সবই দেখছেন। (৩৬) আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[মূসা (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তাঁকে পয়গম্বর করে ফিরাউনকে দাওয়াত দেওয়ার জন্যে প্রেরণ করা হচ্ছে, তখন এই গুরুদায়িত্বের কঠিন কর্তব্যাদি সহজ করার জন্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রার্থনা জানালেন এবং] বললেন, হে আমার পালনকর্তা, আমার বক্ষ (মনোবল আরও বেশী) প্রশস্ত করে দিন (যাতে প্রচারকার্যে হীনমন্যতা অথবা বিরোধিতায় সংকোচবোধ না করি) এবং আমার (এই প্রচারের) কাজ সহজ করে দিন, (যাতে প্রচারের উপকরণাদি সংগৃহীত এবং বাধাবিপত্তি দূর

হয়ে যায়) এবং আমার জিহবা থেকে (তোতলামির) জড়তা দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে এবং আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে আমার জন্য একজন সহকারী নিযুক্ত করুন অর্থাৎ আমার ভাই হারূনকে। তার মাধ্যমে আমার শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং তাকে আমার (এই প্রচারের) কাজে শরীক করুন (অর্থাৎ তাকেও পয়গম্বর করে প্রচারকার্যের আদেশ করুন, যাতে আমরা উভয়েই প্রচার কাজ পরিচালনা করতে পারি এবং আমার অন্তর শক্তিশালী হয়।) যাতে আমরা উভয়েই (প্রচার ও দাওয়াতের সময়) বেশি পরিমাণে (শির্‌ক ও দোষত্রুটি থেকে) আপনার পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি এবং আপনার (গুণাবলীর) প্রচুর পরিমাণে আলোচনা করতে পারি। (কারণ, প্রচারক দু'জন হয়ে গেলে প্রত্যেকের বর্ণনা অপরের সমর্থনে পর্যাপ্ত হয়ে যাবে)। নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে (এবং আমাদের অবস্থা) সম্যক অবলোকন করছেন। (এ অবস্থাদৃষ্টে আমাদের একে অপরের সাহায্যকারী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আপনার খুব জানা রয়েছে)। আল্লাহ্ বললেন ঃ হে মূসা, তোমার (প্রত্যেকটি) প্রার্থনা (যা رَبِّ اشْرَحْ لِي থেকে বর্ণিত হয়েছে) মঞ্জুর করা হল।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত মূসা (আ) যখন আল্লাহ্‌র কালামের গৌরব অর্জন করলেন এবং নবুয়ত ও রিসালতের দায়িত্ব লাভ করলেন, তখন নিজ সত্তা ও শক্তির উপর ভরসা ত্যাগ করে স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলারই দ্বারস্থ হলেন। কারণ, তাঁরই সাহায্যে এই মহান পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর। এ কাজে যেসব বিপদাপদ ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপরিহার্য, সেগুলো হাসিমুখে বরণ করার মনোবলও আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই পাওয়া যেতে পারে। তাই তিনি আল্লাহ্‌র দরবারে পাঁচটি দোয়া চাইলেন। প্রথম দোয়া رَبِّ اشْرَحْ لِي অর্থাৎ আমার বক্ষ উন্মোচন করে দিন এবং এতে এমন প্রশস্ততা দান করুন যে, নবুয়তের জ্ঞান বহন করার যোগ্য হয়ে যায়। ঈমানের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ থেকে যে কটু কথা শুনতে হয়, তা সহ্য করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় দোয়া وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي---(অর্থাৎ আমার কাজ সহজ করে দিন।)

এই উপলব্ধি ও অন্তর্দৃষ্টিও নবুয়তেরই ফলশ্রুতি ছিল যে, কোন কাজের কঠিন হওয়া অথবা সহজ হওয়া বাহ্যিক চেষ্টা-চরিত্রের অধীন নয়। এটাও আল্লাহ্ তা'আলারই দান। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে কারও জন্য কঠিনতর ও গুরুতর কাজ সহজ করে দেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে সহজতর কাজ কঠিন হয়ে যায়। এ কারণেই হাদীসে মুসলমানদেরকে নিম্নোক্ত দোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তারা নিজেদের কাজের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে এভাবে দোয়া করবে ঃ

اَللّٰهُمَّ الْطُفْ بِنَا فِىْ تَيْسِيْرِ كُلِّ عَسِيْرٍ فَاِنَّ تَيْسِيْرَ كُلِّ عَسِيْرٍ عَلَيْكَ يَسِيْرٌ -

(অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করার ব্যাপারে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। কেননা, প্রত্যেক কঠিন কাজ সহজ করে দেয়া আপনার পক্ষে সহজ)।

তৃতীয় দোয়া وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِىْ يَفْقَهُوْا قَوْلِىْ---(অর্থাৎ আমার জিহবার জড়তা দূর করে দিন, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে)। এই জড়তার কাহিনী এই যে, হযরত মূসা (আ) দুগ্ধ পান করার যমানায় তাঁর জননীর কাছেই ছিলেন এবং জননী ফিরাউনের দরবার থেকে দুধ পান করানোর ভাতা পেতে থাকেন। শিশু মূসা দুধ ছেড়ে দিলে ফিরাউন ও তার স্ত্রী আছিয়া তাঁকে পালক পুত্ররূপে নিজেদের কাছে নিয়ে যায়। এ সময়েই একদিন শিশু মূসা (আ) ফিরাউনের দাড়ি ধরে তার গালে একটি চপেটাঘাত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, তিনি একটি ছড়ি হাতে নিয়ে খেলা করছিলেন। এক সময় এই ছড়ি দ্বারা তিনি ফিরাউনের মাথায় আঘাত করে বসেন। ফিরাউন রাগান্বিত হয়ে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা করল। স্ত্রী আছিয়া বললেনঃ রাজাধিরাজ! আপনি অবুঝ শিশুর অপরাধ ধরবেন না। সে তো এখনও ভাল ও মন্দের পার্থক্যও বোঝে না। আপনি ইচ্ছা করলে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। ফিরাউনকে পরীক্ষা করানোর জন্য আছিয়া একটি বাসনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও অপর একটি বাসনে মণিমুক্তা এনে মূসা (আ)-র সামনে রেখে দিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, সে অবুঝ শিশু। শিশুসুলভ অভ্যাস অনুযায়ী সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল সুন্দর মনে করে তা ধরার জন্য হাত বাড়াবে। মণিমুক্তার চাকচিক্য শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত হয় না। এতে ফিরাউন বুঝতে পারবে যে, সে যা করেছে, অজ্ঞতাবশত করেছে, কিন্তু এখানে কোন সাধারণ শিশু ছিল না। আল্লাহ্‌র ভাবী রসূল ছিলেন, যাঁর স্বভাব-প্রকৃতি জন্মলগ্ন থেকেই অনন্যসাধারণ হয়ে থাকে। মূসা (আ) আগুনের পরিবর্তে মণিমুক্তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াতে চাইলেন; কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের বাসনে রেখে দিলেন এবং মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ আগুনের স্ফুলিঙ্গ তুলে মুখে পুরে নিলেন। ফলে তাঁর জিহবা পুড়ে গেল। এতে ফিরাউন বিশ্বাস করল যে, মূসা (আ)-র এই কর্ম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়; এটা ছিল নিতান্তই বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত। এ ঘটনা থেকেই মূসা (আ)-র জিহবায় এক প্রকার জড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়। কোরআনে একেই عُقْدَةً বলা হয়েছে এবং এটা দূর করার জন্যই মূসা (আ) দোয়া করেন।---(মাযহারী, কুরতুবী)

প্রথমোক্ত দোয়া দু'টি সকল কাজে আল্লাহ্‌র সাহায্য হাসিল করার জন্য ছিল। তৃতীয় দোয়ায় নিজের একটি দুর্বলতা নিরসনের জন্য প্রার্থনা জানানো হয়েছে; কারণ, রিসালত ও দাওয়াতের জন্য স্পষ্টভাষী ও বিশুদ্ধভাষী হওয়াও একটি জরুরী বিষয়। পরবর্তী এক আয়াতে বলা হয়েছে যে, মূসা (আ)-র সব দোয়া কবূল করা হয়েছে। এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, জিহ্‌বার তোতলামিও দূরীকরণ হয়ে থাকবে। কিন্তু স্বয়ং মূসা (আ) হযরত হারূন (আ)-কে

রিসালতের কাজে সহকারী করার যে দোয়া করেছেন, তাতে একথাও বলেছেন যে, هُوَ اَفْصَحُ مِنِّىْ لِسَانًا অর্থাৎ হারূন আমার চাইতে অধিক বিশুদ্ধভাষী। এ থেকে জানা যায় যে, তোতলামির প্রভাব কিছুটা বাকী ছিল। এছাড়া ফিরাউন হযরত মূসা (আ)-র চরিত্রে যেসব দোষ আরোপ করেছিল, তন্মধ্যে একটি ছিল এই, وَلَا يَكَادُ يُبِيْنُ---অর্থাৎ সে তার বক্তব্য পরিষ্কার ব্যক্ত করতে পারে না। কোন কোন আলিম এর উত্তরে বলেন ঃ হযরত মূসা (আ) স্বয়ং তাঁর দোয়ায় জিহবার জড়তা এতটুকু দূর করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যতটুকু লোকেরা তাঁর কথা বুঝতে পারে। বলা বাহুল্য, সেই পরিমাণ জড়তা দূর করে দেয়া হয়েছিল। এরপরও তোতলামির সামান্য প্রভাব বাকী থাকলে তা দোয়া কবুল হওয়ার পরিপন্থী নয়।

চতুর্থ দোয়া وَاجْعَلْ لِّىْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِىْ---অর্থাৎ আমার পরিবারবর্গ থেকেই আমার জন্য একজন উজির করুন। পূর্বোক্ত দোয়া তিনটি ছিল নিজ সত্তা সম্পর্কিত। এই চতুর্থ দোয়া রিসালতের করণীয় কাজ আনজাম দেয়ার জন্য উপায়াদি সংগ্রহ করার সাথে সম্পর্ক রাখে। হযরত মূসা (আ) সাহায্য করতে সক্ষম এমন একজন উজির নিযুক্তিকে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উপায় সাব্যস্ত করেছেন। অভিধানে উজিরের অর্থই বোঝা বহনকারী। রাষ্ট্রের উজির তার বাদশাহ্‌র বোঝা দায়িত্ব সহকারে বহন করেন। তাই তাকে উজির বলা হয়। এ থেকে হযরত মূসা (আ)-র পরিপূর্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় যে, কোন সাংগঠনিক কাজ অথবা আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বাগ্রে সহকর্মী ও সাহায্যকারীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ; পসন্দসই সাহায্যকারী পাওয়া গেলে পরবর্তীতে সব কাজ সহজ হয়ে যায়। সহকর্মীদল ভ্রান্ত হলে যাবতীয় উপায় ও উপকরণাদি অকেজো হয়ে পড়ে। আজকালকার রাষ্ট্র ও সরকারসমূহে যেসব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, এগুলোর আসল কারণ রাষ্ট্রপ্রধানের সহকর্মী মন্ত্রী ও দায়িত্বশীলদের কর্তব্যবিমুখতা, দুষ্কর্ম ও অযোগ্যতা ছাড়া কিছুই নয়।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা অর্পণ করেন এবং চান যে, সে ভাল কাজ করুক এবং সুচারুরূপে রাষ্ট্র পরিচালনা করুক, তখন তার সাহায্যের জন্য একজন সৎ উজির দান করেন। রাষ্ট্রপ্রধান কোন জরুরী কাজ ভুলে গেলে তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি যে কাজ করতে চান, উজির তাতে তাঁকে সাহায্য করেন। (নাসায়ী)

এই দোয়ায় হযরত মূসা (আ) যে উজির প্রার্থনা করেছেন, তার সাথে مِنْ اَهْلِىْ কথাটিও যুক্ত করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এই উজির পরিবারের মধ্য থেকে হওয়া উচিত। কেননা, পরিবারভুক্ত ব্যক্তির অভ্যাস-আচরণ জানাশোনা এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক

সম্প্রীতি ও মিল-মহব্বত থাকে। ফলে কাজে সাহায্য পাওয়া যায়; তবে তার মধ্যে কাজের যোগ্যতা থাকা এবং অপরের চাইতে উত্তম বিবেচনায় মনোনীত হওয়া শর্ত। নিছক স্বজনপ্রীতির ভিত্তিতে মনোনীত না হওয়া চাই। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে সততা ও আন্তরিকতা অনুপস্থিত এবং প্রকৃত কাজের চিন্তা কারও মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। তাই কোন শাসনকর্তার সাথে তার আত্মীয়স্বজনকে মন্ত্রী অথবা উপমন্ত্রী নিযুক্ত করাকে নিন্দনীয় মনে করা হয়। যেক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতার পুরোপুরি ভরসা থাকে, সেখানে কোন সৎকর্মপরায়ণ আত্মীয়কে কোন উচ্চপদ দান করা দোষের কথা নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির নিষ্পত্তির জন্য অধিক উত্তম। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পর খুলাফায়ে রাশিদীন সাধারণত তাঁরাই হয়েছেন, যাঁরা নবী-পরিবারের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রাখতেন।

মূসা (আ) তাঁর দোয়ায় প্রথমে তো অনির্দিষ্টভাবেই বলেছেন যে, উজির আমার পরিবারভুক্ত ব্যক্তি হওয়া চাই। অতঃপর নির্দিষ্ট করে বলেছেন যে, আমি যাকে উজির করতে চাই, সে আমার ভাই হারূন---যাতে রিসালতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিতে আমি তার কাছ থেকে শক্তি অর্জন করতে পারি।

হযরত হারূন (আ) হযরত মূসা (আ) থেকে তিন অথবা চার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং তিন বছর পূর্বেই ইন্তিকাল করেন। মূসা (আ) যখন এই দোয়া করেন, তখন তিনি মিসরে অবস্থান করছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-র দোয়ার ফলে তাঁকেও পয়গম্বর করে দেন। ফেরেশতার মাধ্যমে তিনি মিসরেই এ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মূসা (আ)-কে যখন মিসরে ফিরাউনকে দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়, তখন হারূন (আ)-কে মিসরের বাইরে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। তিনি তাই করেন। ---(কুরতুবী)

وَاَشْرِكْهُ فِىْ اَمْرِىْ---হযরত মূসা (আ) হারূন (আ)-কে নিজের উজির করতে চেয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই তা করতে পারতেন। এ অধিকার তাঁর ছিল। কিন্তু বরকতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মনোনীত করার দোয়া করেছেন। সাথে সাথে তিনি তাঁকে নবুয়ত ও রিসালতে শরীক করতেও চাইলেন। কোন নবী ও রসূলের এরূপ অধিকার নেই। তাই এর জন্য পৃথক দোয়া করেছেন যে, তাঁকে আমার রিসালতে অংশীদার করে দিন। পরিশেষে বলেছেন ঃ

সৎকর্মপরায়ণ সঙ্গী যিক্‌র ও ইবাদতেও সাহায্যকারী হয় ঃ كَىْ نُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا

وَّنَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ---অর্থাৎ হযরত হারূনকে উজির ও নবুয়তে অংশীদার করলে এই উপকার হবে যে, আমরা বেশি পরিমাণে আপনার যিকর ও পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারব। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, তসবীহ্ ও যিকর মানুষ একাও যত ইচ্ছা করতে পারে। এতে

কোন সঙ্গীর কাজের কি প্রয়োজন আছে? কিন্তু চিন্তা করলে জানা যায় যে, তসবীহ্ ও যিকরের উপযুক্ত পরিবেশ এবং আল্লাহ্ভক্ত সঙ্গীদের অনেক প্রভাব রয়েছে। যার সঙ্গী-সহচর আল্লাহ্-ভক্ত নয়, সে ততটুকু ইবাদত করতে পারে না, যতটুকু আল্লাহ্ভক্তদের পরিবেশে একজন করতে পারে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র যিকরে মশগুল থাকতে চায়, তার উপযুক্ত পরিবেশও তালাশ করা উচিত।

এ পর্যন্ত পাঁচটি দোয়া সমাপ্ত হল। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করা হয়েছে। قَالَ قَدْ اُوْتِيْتَ سُؤْلَكَ يَا مُوْسٰى অর্থাৎ হে মূসা, তুমি যা যা চেয়েছ, সবই তোমাকে প্রদান করা হল।

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرٰى ﴿٣٧﴾ اِذْ اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّكَ مَا يُوْحٰٓى ﴿٣٨﴾ اَنِ
اقْذِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاقْذِفِيْهِ فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوٌّ لَّهٗ ؕ وَاَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّىْ ۚ وَلِتُصْنَعَ
عَلٰى عَيْنِىْ ﴿٣٩﴾ اِذْ تَمْشِىْٓ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهٗ ؕ
فَرَجَعْنٰكَ اِلٰٓى اُمِّكَ كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ؕ وَقَتَلْتَ نَفْسًا
فَنَجَّيْنٰكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنّٰكَ فُتُوْنًا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِىْٓ اَهْلِ مَدْيَنَ ۙ
ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ يّٰمُوْسٰى ﴿٤٠﴾ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِىْ ﴿٤١﴾ اِذْهَبْ اَنْتَ وَ
اَخُوْكَ بِاٰيٰتِىْ وَلَا تَنِيَا فِىْ ذِكْرِىْ ﴿٤٢﴾ اِذْهَبَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿٤٣﴾
فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

(৩৭) আমি তোমার প্রতি আরও একবার অনুগ্রহ করেছিলাম। (৩৮) যখন আমি তোমার মাতাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যা অতঃপর বর্ণিত হচ্ছে (৩৯) যে, তুমি তাকে (মূসাকে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তা দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, অতঃপর দরিয়া তাকে তীরে ঠেলে দেবে। তাকে আমার শত্রু ও তার শত্রু উঠিয়ে নেবে। আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে, যাতে তুমি আমার দৃষ্টির সামনে

প্রতিপালিত হও। (৪০) যখন তোমার ভগিনী এসে বলল ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব কে তাকে লালন-পালন করবে। অতঃপর আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় এবং দুঃখ না পায়। তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, অতঃপর আমি তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি দেই ; আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষা করেছি। অতঃপর তুমি কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করেছিলে ; হে মূসা! অতঃপর তুমি নির্ধারিত সময়ে এসেছ। (৪১) এবং আমি তোমাকে আমার নিজের জন্যে তৈরী করে নিয়েছি। (৪২) তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ যাও এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। (৪৩) তোমরা উভয়ে ফিরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। (৪৪) অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তাভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি তো আরও একবার (অনুরোধ ছাড়াই) তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম, যখন আমি তোমার মাতাকে সেই ইলহাম করেছিলাম, যা (গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে) ইলহাম দ্বারা বলার (যোগ্য) ছিল। (তা) এই যে, মূসাকে (জল্লাদদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে) সিন্দুকে রাখ, অতঃপর তাকে (সিন্দুকসহ) দরিয়ায় (যার একটি শাখা ফিরাউনের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত গিয়েছিল) ভাসিয়ে দাও। এরপর দরিয়া তাকে (সিন্দুকসহ) তীরে নিয়ে আসবে। (অবশেষে) তাকে এমন এক ব্যক্তি ধরবে, যে (কাফির হওয়ার কারণে) আমার শত্রু এবং তারও শত্রু (হয় তো উপস্থিত কালেই ; কারণ সে সব পুত্র সন্তানকে হত্যা করত অথবা ভবিষ্যতে তার বিশেষ শত্রু হবে।) এবং (যখন সিন্দুক ধরা হল এবং তোমাকে তা থেকে বের করা হল, তখন) আমি তোমার (মুখমণ্ডলের) ওপর নিজের পক্ষ থেকে মায়ামমতার চিহ্ন ফুটিয়ে তুললাম (যাতে তোমাকে যে-ই দেখে, সে-ই আদর করে) এবং যাতে তুমি আমার (বিশেষ) তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত হও। (এটা তখনকার কথা,) যখন তোমার ভগিনী (তোমার খোঁজে ফিরাউনের গৃহে) হেঁটে আসল, অতঃপর (তোমাকে দেখে অপরিচিতা হয়ে) বলল ঃ (যখন তুমি কোন ধাত্রীর দুধ পান করছিলে না) আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির কথা বলে দেব, যে তাকে (উত্তমরূপে) লালন-পালন করবে? (সেমতে তারা যেহেতু এমন ব্যক্তি তালাশ করছিল তাই তার কথা মঞ্জুর করল। এবং তোমার ভগিনী তোমার মাতাকে ডেকে আনল।) অতঃপর (এই কৌশলে) আমি তোমাকে তোমার মাতার কাছে আবার পৌঁছিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তার কোন দুঃখ না থাকে (যেমন বিচ্ছেদের কারণে সে কিছুকাল দুঃখিতা ছিল।) এবং বড় হওয়ার পর আরও একটি অনুগ্রহ করেছি যে,) তুমি ভুলক্রমে এক (কিবতী) ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে (সূরা কাসাসে এই কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হত্যার পর তুমি চিন্তিত হয়েছিলে---শাস্তির ভয়েও এবং প্রতিশোধের ভয়েও) অতঃপর আমি তোমাকে এই চিন্তা থেকে মুক্তি দেই (ক্ষমা প্রার্থনার তওফীক দিয়ে শাস্তির ভয় থেকে এবং মিসর থেকে মাদইয়ানে পৌঁছিয়ে প্রতিশোধের ভয় থেকে মুক্তি দেই) এবং

(মাদইয়ান পৌঁছা পর্যন্ত) আমি তোমাকে অনেক পরীক্ষায় ফেলেছি (এবং সেগুলোতে উত্তীর্ণ করেছি। সূরা কাসাসে এর বিস্তারিত বিবরণ আছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা যেমন অনুগ্রহ, তেমনি পরীক্ষায় ফেলাও অনুগ্রহ ; কারণ, এটা উত্তম চরিত্র ও উৎকৃষ্ট নৈপুণ্য লাভের কারণ। সুতরাং তা স্বতন্ত্র অনুগ্রহ)।

অতঃপর তুমি (মাদইয়ান পৌঁছলে এবং) কয়েক বছর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে অবস্থান করলে। হে মূসা, অতঃপর বিশেষ এক সময়ে) যা আমার জ্ঞানে তোমার নবুয়ত ও প্রত্যক্ষ কথাবার্তার জন্যে অবধারিত ছিল, এখানে (এসেছ এবং এখানে আসার পর) আমি তোমাকে নিজের (নবী করার) জন্য মনোনীত করেছি। (অতএব এখন) তুমি ও তোমার ভাই উভয়েই আমার নিদর্শনাবলী (অর্থাৎ দু'টি মূল মু'জিযা--লাঠি ও শ্বেতশুভ্র হাত, প্রত্যেকটিতে অলৌকিকতার বহু প্রকাশ রয়েছে---) নিয়ে (যে স্থানের জন্য আদেশ হয় সেখানে) যাও এবং আমার স্মরণে (নির্জনে অথবা প্রচার ক্ষেত্রে) শৈথিল্য করো না। (এখানে যাওয়ার স্থান বলা হচ্ছে যে) উভয়েই ফিরাউনের কাছে যাও। সে খুব উদ্ধত হয়েছে। অতঃপর (তার কাছে গিয়ে) নম্র কথা বল। হয়ত সে (সাগ্রহে) উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহ্‌র শাস্তিকে) ভয় করবে (এবং এ কারণে মেনে নেবে)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ---হযরত মূসা (আ)-কে এ সময় বাক্যালাপের গৌরবে ভূষিত করা হয়েছে, নবুয়ত ও রিসালত দান করা হয়েছে এবং বিশেষ বিশেষ মু'জিযা প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাঁকে সেসব নিয়ামতও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যেগুলো জন্মের প্রারম্ভ থেকে এ যাবৎ প্রতিযুগে তাঁর জন্যে ব্যয়িত হয়েছে। উপর্যুপরি পরীক্ষা এবং প্রাণনাশের আশংকার মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলা বিস্ময়কর পন্থায় তাঁর জীবন রক্ষা করেছেন। পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব নিয়ামত উল্লিখিত হয়েছে, বাস্তব ঘটনার দিক দিয়ে সেগুলো পূর্ববর্তী। এগুলোকে এখানে أُخْرَىٰ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার অর্থ এরূপ নয় যে, এই নিয়ামতগুলো পরবর্তীকালের। বরং أُخْرَىٰ শব্দটি কোন সময় শুধু 'অন্য' অর্থ বোঝায়। এতে অগ্রপশ্চাতের কোন অর্থ থাকে না। এখানেও শব্দটি এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। (রূহুল-মাআনী) মূসা (আ)-র এই আদ্যোপান্ত কাহিনী হাদীসের বরাত দিয়ে সম্মুখে বর্ণিত হবে।

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ---অর্থাৎ যখন আমি তোমার মাতার কাছে এমন ব্যাপারে ওহী করলাম, যা ওহীর মাধ্যমেই জানানো যেতে পারত। তা এই যে, ফিরাউন তার সিপাহীদেরকে ইসরাঈলী নবজাত শিশুদেরকে হত্যা করার আদেশ দিয়ে রেখেছিল। তাই সিপাহীদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে তাঁর মাতাকে ওহীর মাধ্যমে বলা হল যে, তাকে একটি সিন্দুকে রেখে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং তার ধ্বংসের আশংকা করো না। আমি

তাকে হিফাযতে রাখব এবং শেষে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব। বলা বাহুল্য, এসব কথা বিবেকগ্রাহ্য নয়। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা এবং তাঁর হিফাযতের অবিশ্বাস্য ব্যবস্থা একমাত্র তাঁর পক্ষ থেকে বিবৃতির মাধ্যমেই জানা যেতে পারে।

নবী রসূল নয়---এমন ব্যক্তির কাছে ওহী আসতে পারে কি? وحی শব্দের আভিধানিক অর্থ এমন গোপন কথা, যা শুধু যাকে বলা হয় সেই জানে---অন্য কেউ জানে না। এই আভিধানিক অর্থের দিক দিয়ে ওহী কারও বিশেষ গুণ নয়---নবী, রসূল, সাধারণ সৃষ্ট জীব বরং জন্তু-জানোয়ার পর্যন্ত এতে শামিল হতে পারে।

(اَوْحٰى رَبُّكَ اِلَى النَّحْلِ) ---আয়াতে মৌমাছিকে ওহীর মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা এই অর্থের দিক দিয়েই বলা হয়েছে। আলোচ্য اَوْحَيْنَآ اِلٰٓى اُمِّ আয়াতেও আভিধানিক অর্থে 'ওহী' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই এতে মূসা-জননীর নবী অথবা রসূল হওয়া জরুরী হয় না। যেমন, মারইয়ামের কাছেও এভাবে আল্লাহ্র বাণী পৌঁছেছিল, অথচ বিশিষ্ট আলিমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি নবী অথবা রসূল ছিলেন না। এ ধরনের আভিধানিক ওহী সাধারণত ইলহামের আকারে হয়; অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কারও অন্তরে কোন বিষয়বস্তু জাগ্রত করে দেন এবং তাকে নিশ্চিত করে দেন যে, এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই। ওলী-আল্লাহ্গণ সাধারণত এ ধরনের ইলহাম লাভ করেছেন। বরং আবূ হাইয়্যান ও অন্য কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন যে, এ জাতীয় ওহী মাঝে মাঝে ফেরেশতার মাধ্যমেও হতে পারে। উদাহরণত হযরত মারইয়ামের ঘটনায় স্পষ্টত বলা হয়েছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু এই ওহী শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সত্তার সাথেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। জনসংস্কার এবং তবলীগ ও দাওয়াতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর বিপরীতে নবুয়তের ওহীর উদ্দেশ্যই জনসংস্কারের জন্য কাউকে নিয়োগ করা এবং প্রচার ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট করা। এরূপ ব্যক্তির অপরিহার্য দায়িত্ব হচ্ছে নিজের ওহীর প্রতি নিজেও বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অপরকেও তার নবুয়ত ও ওহী মানতে বাধ্য করা; যারা না মানে, তাদেরকে কাফির আখ্যা দেয়া।

ইলহামী ওহী তথা আভিধানিক ওহী এবং নবুয়তের ওহী তথা পারিভাষিক ওহীর মধ্যে পার্থক্য তাই। আভিধানিক ওহী সর্বকালেই জারি আছে এবং থাকবে। কিন্তু নবুয়ত ও নবুওয়তের ওহী শেষনবী মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে। কোন কোন বুযুর্গের উক্তিতে একেই 'ওহী-তশরীয়ী' ও 'গায়র-তশরীয়ী'র শিরোনামে ব্যক্ত করা হয়েছে। শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর কোন কোন বাক্যের বরাত দিয়ে নবুয়তের দাবীদার কাদিয়ানী তার দাবীর বৈধতার প্রমাণ হিসেবে একে উপস্থিত করেছে, যা স্বয়ং ইবনে-আরাবীর সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বাতিল। এই প্রশ্নের পুরাপুরি আলোচনা ও ব্যাখ্যা আমার পুস্তক "খতমে-নবুয়তে" বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

মূসা-জননীর নাম ঃ রূহুল-মা'আনীতে আছে যে, তাঁর প্রসিদ্ধ নাম 'ইউহানিব'। 'ইতকান' গ্রন্থে তাঁর নাম "লাহইয়ানা বিনতে ইয়াসমাদ ইবনে লাভী" লিখিত রয়েছে। কেউ কেউ তাঁর নাম 'বারেখা' এবং কেউ কেউ 'বাযখত' বলেছেন। যারা তাবিজ ইত্যাদি করে, তাদের কেউ কেউ তাঁর নামের আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে। রূহুল-মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন ঃ আমরা এর কোন ভিত্তি খুঁজে পাইনি। খুব সম্ভব এগুলো বাজে কথা।

فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ—এখানে يم শব্দের অর্থ দরিয়া এবং বাহ্যত নীলনদ বোঝানো হয়েছে। আয়াতে এক আদেশ মূসা (আ)-র মাতাকে দেয়া হয়েছে যে, এই শিশুকে সিন্দুকে পুরে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। দ্বিতীয় আদেশ নির্দেশসূচকভাবে দরিয়াকে দেয়া হয়েছে যে, সে যেন এই সিন্দুককে তীরে নিক্ষেপ করে দেয়। দরিয়া বাহ্যত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন। একে আদেশ দেয়ার মর্ম বুঝে আসে না। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এখানে নির্দেশসূচক পদ বলা হলেও আদেশ বোঝানো হয়নি; বরং খবর দেয়া হয়েছে যে, দরিয়া একে তীরে নিক্ষেপ করবে। কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী আলিমদের মতে এখানে আদেশই বোঝানো হয়েছে এবং দরিয়াকে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা, তাদের মতে জগতের কোন সৃষ্টবস্তু বৃক্ষ ও প্রস্তর পর্যন্ত চেতনাহীন ও বোধশক্তিহীন নয়; বরং সবার মধ্যেই বোধশক্তি ও উপলব্ধি বিদ্যমান। এই বোধশক্তি ও উপলব্ধির কারণেই কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী সব বস্তু আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠে মশগুল আছে। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই আছে যে, মানব, জিন ও ফেরেশতা ছাড়া কোন সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নেই, যে পরিমাণ থাকলে হারাম ও হালালের বিধি-বিধান আরোপিত হতে পারে। সাধক রূমী চমৎকার বলেছেন ঃ

خاک و باد و آب و آتش بنده اند
با من وتو مرده با حق زنده اند

(মৃত্তিকা বাতাস পানি ও অগ্নি আল্লাহ্‌র বান্দা। আমার ও তোমার কাছে তারা মৃত; কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে জীবিত।)

يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ— অর্থাৎ এই সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থিত শিশুকে সমুদ্রের তীর থেকে এমন ব্যক্তি কুড়িয়ে নেবে, যে আমার ও মূসার উভয়ের শত্রু; অর্থাৎ ফিরাউন। ফিরাউন যে আল্লাহ্‌র দুশমন, তা তার কুফরের কারণে সুস্পষ্ট। কিন্তু মূসা (আ)-র দুশমন হওয়ার ব্যাপারটি প্রণিধানযোগ্য। কারণ, তখন ফিরাউন মূসা (আ)-র দুশমন ছিল না; বরং তাঁর লালন-পালনে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় করছিল। এতদসত্ত্বেও তাকে মূসা (আ)-র শত্রু বলা হয় শেষ পরিণামের দিক দিয়ে, অর্থাৎ অবশেষে ফিরাউনের শত্রুতে পরিণত হওয়ার বিষয়টি আল্লাহ্‌র জ্ঞানে ছিল। একথা বলাও অযৌক্তিক হবে না যে, ফিরাউন ব্যক্তিগত পর্যায়ে তখনও মূসা (আ)-র শত্রু ছিল। সে স্ত্রী আসিয়ার মন রক্ষার্থেই শিশু মূসার লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। তাই পরে

যখন তার মনে সন্দেহ দেখা দিল, তখনই তাকে হত্যার আদেশ জারি করে দিল, যা আসিয়ার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে বানচাল হয়ে যায়।---(রূহুল মা'আনী, মাযহারী)

وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي—এখানে مَحَبَّةً ধাতু শব্দটি---আদরণীয় হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্ বলেনঃ আমি নিজ কৃপা ও অনুগ্রহে তোমার অস্তিত্বের মধ্যে আদরণীয় হওয়ার গুণ নিহিত রেখেছি। ফলে যে-ই তোমাকে দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। হযরত ইবনে আব্বাস ও ইকরামা থেকে এরূপ তফসীরই বর্ণিত আছে।---(মাযহারী)

وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي—صنعت শব্দ বলে এখানে উত্তম লালন-পালন বোঝান হয়েছে। আরবে صنعت فرسى বাকপদ্ধতিটি এ অর্থেই বলা হয়, অর্থাৎ আমি আমার ঘোড়ার উত্তম লালন-পালন করেছি। عَلَىٰ عَيْنِي বলে على حفظى বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল যে, মূসা (আ)--র উত্তম লালন-পালন সরাসরি আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে হবে। তাই মিসরের সর্বৃহৎ ব্যক্তিত্ব ফিরাউনের গৃহে এই উদ্দেশ্য এমনভাবে সাধন করা হয়েছে যে, সে জানত না নিজের হাতে নিজেরই দুশমনকে লালন-পালন করছে।---(মাযহারী)

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ—মূসা (আ)-র ভগিনী সিন্দুকের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল।

এর পরবর্তী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করে আয়াতের শেষে বলা হয়েছে---وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا---অর্থাৎ আমি বারবার তোমাকে পরীক্ষা করেছি---(ইবনে আব্বাস)। অথবা তোমাকে বারবার পরীক্ষায় ফেলেছি---(যাহ্হাক)। এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বিস্তারিত বিবরণ নাসায়ীর একটি দীর্ঘ হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের রিওয়ায়েতে উদ্ধৃত হয়েছে। তা এই ঃ

মূসা (আ)-র বিস্তারিত কাহিনী ঃ নাসায়ীর তফসীর অধ্যায়ে 'হাদীসুল ফুতুন' নামে ইবনে-আব্বাসের রেওয়ায়েতে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, ইবনে কাসীরেও তা পুরোপুরি উদ্ধৃত করার পর বলা হয়েছে, হযরত ইবনে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটিকে মরফূ' অর্থাৎ, বিরতিহীন বর্ণনার মাধ্যমে প্রাপ্ত রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বর্ণনা আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে কাসীর নিজেও তা সমর্থন করেছেন ঃ وصدق ذلك عندى অর্থাৎ এ হাদীসটির মরফূ' হওয়া আমার মতে ঠিক। অতঃপর তিনি একটি প্রমাণও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপর একথাও লিখেছেন যে, ইবনে-জারীর এবং ইবনে আ'বী

হাতেমও তাঁদের তফসীর গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন; কিন্তু একে মওকুফ অর্থাৎ ইবনে-আব্বাসের নিজের বর্ণনা বলেছেন। মরফূ' হাদীসের বাক্য এতে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয়, ইবনে আব্বাস এই রেওয়ায়েতটি কা'বে-আহবারের কাছ থেকে লাভ করেছেন ঃ যেমন অনেক জায়গায় এরূপ হয়েছে। কিন্তু হাদীসের সমালোচক ইবনে-কাসীর এবং হাদীসের ইমাম নাসায়ী একে 'মরফূ' স্বীকার করেন। যারা মরফূ' স্বীকার করেন না, তারাও এর বিষয়বস্তু অস্বীকার করেন না। অধিকাংশ বিষয়বস্তু স্বয়ং কোরআনের আয়াতে বিধৃত হয়েছে। তাই আগাগোড়া হাদীসের অনুবাদ লেখা হচ্ছে। এতে মূসা (আ)-র বিস্তারিত ঘটনার সাথে সাথে অনেক শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয়বস্তুও জানা যাবে।

হাদীসুল ফুতুন ঃ ইমাম নাসায়ীর সনদে কাসেম ইবনে আবূ আইয়ুবের বর্ণনা ঃ আমাকে সাঈদ ইবনে জুবায়র জানিয়েছেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে মূসা (আ) সম্পর্কে কোরআনের وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا আয়াতের তফসীর জিজ্ঞেস করলাম যে, এখানে فتون বলে কি বোঝানো হয়েছে? ইবনে আব্বাস বললেন ঃ এই ঘটনা অতিদীর্ঘ। প্রত্যুষে আমার কাছে এস---বলে দেব। পরদিন খুব ভোরেই আমি তাঁর কাছে হাজির হলাম, যাতে গতকালের ওয়াদা পুরা করিয়ে নেই। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন ঃ শোন, একদিন ফিরাউন ও তার পারিষদবর্গ আলোচনা প্রসঙ্গে বলাবলি করল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ইব্রাহীমের কাছে ওয়াদা করেছেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বর ও বাদশাহ্ পয়দা করবেন। এ কথা শুনে উপস্থিত লোকদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, হ্যাঁ, বনী ইসরাঈল অপেক্ষা করছে যে, তাদের মধ্যে কোন নবী ও রসূল জন্মগ্রহণ করবেন। এ বিষয়ে তারা বিন্দুমাত্রও দ্বিধাগ্রস্ত নয়। পূর্বে তাদের ধারণা ছিল যে, সে নবী হলেন ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব (আ)। তাঁর ইন্তেকালের পর তারা বলতে শুরু করেছে যে, ইউসুফ (আ) ওয়াদাকৃত পয়গম্বর নন। (অন্য কোন নবী ও রসূলের মাধ্যমে এই ওয়াদা পূর্ণ হবে।) ফিরাউন এ কথা শুনে চিন্তান্বিত হয়ে পড়ল যে, বনী ইসরাঈল তো এখন তার গোলাম। যদি তাদের মধ্যে কোন নবী ও রসূল পয়দা হয়, তবে বনী ইসরাঈলকে অবশ্যই মুক্ত করবে। তাই সে সভাসদদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? সভাসদরা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হল যে, ইসরাঈল বংশে কোন ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে হত্যা করতে হবে। সেমতে এ কাজে বিশেষ বাহিনী নিযুক্ত করা হল। তাদের প্রত্যেকের হাতে ছুরি থাকত। তারা বনী ইসরাঈলের ঘরে ঘরে তল্লাশী চালিয়ে ছেলে সন্তান দৃষ্টিগোচর হলেই তাকে হত্যা করে ফেলত।

বেশ কিছুকাল পর্যন্ত এই কর্মপদ্ধতি অব্যাহত থাকার পর তাদের চৈতন্যোদয় হল। তারা দেখল যে, দেশের যাবতীয় মেহনত-মজুরি ও শ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম তো বনী-ইসরাঈলই আনজাম দেয়। এভাবে হত্যাযজ্ঞ অব্যাহত থাকলে তাদের বৃদ্ধদের মৃত্যুর পর ভবিষ্যতে বনী-ইসরাঈলের মধ্যে কোন পুরুষও অবশিষ্ট থাকবে না, যে

দেশের কাজকর্ম আনজাম দেবে। ফলে পরিশ্রমসাপেক্ষ কাজকর্ম আমাদেরকেই সম্পন্ন করতে হবে। তাই পুনঃসিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, প্রথম বছর যেসব ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং দ্বিতীয় বছর যারা জন্মগ্রহণ করবে, তাদেরকে হত্যা করা হবে। ছেড়ে দেয়া ও হত্যা করার ধারা এই নিয়মেই চলবে। এভাবে বনী ইসরাঈলের মধ্যে কিছুসংখ্যক যুবকও থাকবে, যারা বৃদ্ধদের স্থলাভিষিক্ত হবে এবং তাদের সংখ্যা এত বেশিও হবে না, যা ফিরঊনী রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। সেমতে এ আইনই রাজ্যময় জারি করে দেয়া হল। এ দিকে আল্লাহ্‌র কুদরত এভাবে প্রকাশ পেল যে, মূসা-জননীর গর্ভে এক সন্তান তখনই জন্মগ্রহণ করল যখন সন্তানদেরকে জীবিত ছেড়ে দেয়ার বছর ছিল। এ সন্তান ছিল হযরত হারূন (আ)। ফিরাউনী আইনের দৃষ্টিতে তাঁর কোন বিপদাশঙ্কা ছিল না। এর পরবর্তী পুত্রসন্তান হত্যার বছরে হযরত মূসা (আ)-র মাতার গর্ভসঞ্চার হলে তিনি দুঃখে বিষাদে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কারণ, এই সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই তাকে হত্যা করতে হবে। হযরত ইবনে-আব্বাস এ পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা করে বলেন ঃ হে ইবনে-জুবায়র, فتون অর্থাৎ পরীক্ষার এ হচ্ছে প্রথম পর্ব। মূসা (আ) তখনও দুনিয়াতে জন্মগ্রহণ করেননি, এমতাবস্থায় তাঁর হত্যার পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা মূসা-জননীকে ইলহামী ইশারার মাধ্যমে এরূপ সান্ত্বনা দিলেন ঃ

لَا تَخَافِيْ وَلَا تَحْزَنِيْ إِنَّا رَادُّوْهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

—অর্থাৎ তুমি ভয় ও দুঃখ করো না। আমি তার হিফাযত করব এবং কিছুদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর আমি তাকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব। অতঃপর তাকে আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করে নেব। যখন মূসা (আ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর মাতাকে আদেশ দিলেন, বাচ্চাকে একটি সিন্দুকে রেখে নীল দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও। মূসা-জননী এ আদেশ পালন করলেন। তিনি যখন সিন্দুকটি দরিয়ায় ভাসিয়ে দিলেন, তখন শয়তান তাঁর মনে এরূপ কুমন্ত্রণা নিক্ষেপ করল যে, তুমি এ কি করলে? যদি বাচ্চা তোমার কাছে থেকে নিহতও হত, তবে তুমি নিজ হাতে তার কাফন-দাফন করে কিছুটা সান্ত্বনা পেতে। এখন তো তাকে সামুদ্রিক জন্তুরা খেয়ে ফেলবে। মূসা-জননী এই দুঃখ ও বিষাদে মুহ্যমান ছিলেন, এমন সময় দরিয়ার ঢেউ সিন্দুকটিকে একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নিক্ষেপ করল। সেখানে ফিরাউনের বাঁদী-দাসীরা গোসল করতে যেত। তারা সিন্দুকটি দেখে তা কুড়িয়ে আনল এবং খোলার ইচ্ছা করল। তখন তাদের একজন বলল ঃ যদি এতে টাকাকড়ি থাকে এবং আমরা খুলে ফেলি, তবে ফিরাউন-পত্নী সন্দেহ করবে যে, আমরা কিছু টাকাকড়ি সরিয়ে ফেলেছি। এরপর আমরা যাই বলি না কেন, সে বিশ্বাস করবে না। তাই সবাই একমত হল যে, সিন্দুকটি যেমন আছে, তেমনিই ফিরাউন-পত্নীর সামনে পেশ করা হবে।

ফিরাউন-পত্নী সিন্দুক খুলেই তাতে একটি নবজাত শিশুকে দেখতে পেলেন। দেখা মাত্রই শিশুর প্রতি তাঁর মনে গভীর মায়ামমতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, যা ইতিপূর্বে

কোন শিশুর প্রতি হয়নি। এটা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي উক্তিরই বহিঃপ্রকাশ ছিল। অপরদিকে মূসা-জননী শয়তানের কুমন্ত্রণার ফলে আল্লাহ্ তা'আলার উপরোক্ত ওয়াদা ভুলে গেলেন এবং কোরআনের ভাষায় তাঁর অবস্থা দাঁড়াল فَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا---অর্থাৎ মূসা-জননীর অন্তর যাবতীয় আনন্দ ও কল্পনা থেকে শূন্য হয়ে গেল। পুত্রের চিন্তা ছাড়া তাঁর অন্তরে আর কোন কিছুই ছিল না। এদিকে পুত্রসন্তানের হত্যাকার্যে আদিষ্ট সিপাহীরা যখন জানতে পারল যে, ফিরাউনের গৃহে একটি ছেলে-সন্তান আগমন করেছে, তখন তারা ছুরি নিয়ে ফিরাউন পত্নীর কাছে উপস্থিত হল এবং দাবি করল যে, ছেলেটিকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা তাকে হত্যা করব।

এ পর্যন্ত পৌঁছে হযরত ইবনে-আব্বাস ইবনে জুবায়রকে আবার বললেন ঃ হে ইবনে জুবায়র, এটা হযরত মূসা (আ)-র পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্ব।

ফিরাউন-পত্নী সিপাহীদেরকে বললেন ঃ একটু থাম। একটিমাত্র ছেলের কারণে তো বনী ইসরাঈলের শক্তি বেড়ে যাবে না। আমি ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। দেখি, তিনি ছেলেটির প্রাণভিক্ষা দেন কিনা! ফিরাউন তাকে ক্ষমা করলে উত্তম, নতুবা তোমাদের কাজে আমি বাধা দেব না; ছেলেটিকে তোমাদের হাতেই তুলে দেব। একথা বলে তিনি ফিরাউনের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ এই শিশুটি আমার ও তোমার চোখের মণি। ফিরাউন বলল ঃ হ্যাঁ, তোমার চোখের মণি হওয়া তো বোঝাই যায়; কিন্তু আমি এরূপ মণির প্রয়োজন অনুভব করি না।

অতঃপর ইবনে-আব্বাস বললেন ঃ রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম, যদি ফিরাউন তখন নিজের চোখের মণি হওয়া স্বীকার করে নিত, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও হিদায়েত করতেন, যেমন তার পত্নী আছিয়াকে হিদায়েত করেছেন।

মোটকথা, স্ত্রীর কথায় ফিরাউন শিশুকে হত্যার কবল থেকে মুক্ত করে দিল। এখন ফিরাউন-পত্নী তাকে দুধ পান করানোর জন্য আশেপাশের মহিলাদেরকে ডাকল। সবাই এ কাজ আনজাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, শিশুটি কারও স্তন পান করল না। (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ) এখন ফিরাউন-পত্নী মহাভাবনায় পড়লেন যে, যদি শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ না করে, তবে জীবিত থাকবে কিরূপে ? তিনি শিশুটিকে বাঁদীদের হাতে দিয়ে বললেন ঃ একে বাজারে এবং জনসমাবেশে নিয়ে যাও। সম্ভবত, সে কোন মহিলার দুধ কবুল করবে।

এদিকে মূসা-জননী পাগলপারা হয়ে নিজ কন্যাকে বললেনঃ বাইরে গিয়ে তার একটু খোঁজ নাও এবং লোকদের কাছে জিজ্ঞেস কর যে ঐ সিন্দুক ও নবজাত শিশুর কি দশা হয়েছে, সে জীবিত আছে, না সামুদ্রিক জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে? মূসা (আ)-র হিফাযত ও কয়েকদিন পর তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ্ তা'আলা গর্ভাবস্থায় তাঁর সাথে করেছিলেন, তখন পর্যন্ত সেই ওয়াদা তাঁর স্মরণে ছিল না। হযরত মূসার ভগিনী বাইরে গিয়ে আল্লাহ্র কুদরতের এই লীলা দেখতে পেলেন যে, ফিরাউনের বাঁদীরা শিশুটিকে কোলে নিয়ে ধাত্রীর খোঁজে ঘোরাফেরা করছে। সে যখন জানতে পারল যে, শিশুটি কারও দুধ গ্রহণ করছে না এবং এজন্য বাঁদীরা খুব উদ্বিগ্ন, তখন তাদেরকে বলল ঃ আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের সন্ধান দেব যেখানে আশা করা যায় যে, সে তাদের দুধ গ্রহণ করবে এবং তারাও একে শুভেচ্ছা ও আদর-যত্ন সহকারে লালন-পালন করবে। একথা শুনে বাঁদীরা তাকে পাকড়াও করল। তাদের সন্দেহ হল যে, বোধ হয় এই মহিলাই শিশুটির জননী অথবা কোন নিকট-আত্মীয়া। ফলে সে আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারছে যে, ঐ পরিবার তার হিতাকাঙ্ক্ষী। তখন ভগিনীও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল।

এখানে পৌঁছে ইবনে-আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেনঃ এটা ছিল পরীক্ষার তৃতীয় পর্ব।

তখন মূসা-ভগিনী নতুন কথা উদ্ভাবন করে বলল ঃ ঐ পরিবারটি শিশুর হিতাকাঙ্ক্ষী বলায় আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তারা রাজদরবারে পৌঁছতে পারবে এবং আর্থিক দিক দিয়ে অনেক লাভবান হবে---এই আশায় তারা শিশুটির আদর-যত্নে ও শুভেচ্ছায় কোন ত্রুটি করবে না। এই ব্যাখ্যা শুনে বাঁদীরা তাকে ছেড়ে দিল। সে গৃহে ফিরে মাতাকে আদ্যোপান্ত ঘটনার সংবাদ দিল। মাতা তাকে নিয়ে বাঁদীরা যেখানে সমবেত ছিল, সেখানে পৌঁছলেন। বাঁদীদের কথায় তিনি শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ তাঁর স্তনের সাথে একাত্ম হয়ে দুধ পান করতে লাগলেন এবং পেট ভরে দুধ পান করলেন। শিশুর জন্য উপযুক্ত ধাত্রী পাওয়া গেছে এই সংবাদ শুনে ফিরাউন-পত্নী মূসা-জননীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি যখন দেখলেন এবং বুঝলেন যে, ফিরাউন-পত্নী তাঁর তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছে, তখন তিনি আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে গেলেন। ফিরাউন-পত্নী বললেনঃ তুমি এখানে থেকেই শিশুকে দুধ পান করাবে। কেননা, অপরিসীম মহব্বতের কারণে তাকে আমি আমার দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পারব না। মূসা-জননী বললেনঃ আমি তো নিজের বাড়িঘর ছেড়ে এখানে থাকতে পারি না। কারণ আমার কোলে একটি শিশু আছে। আমি তাকে দুধ পান করাই। তাকে আমি কিরূপে ছেড়ে দিতে পারি? হ্যাঁ, আপনি যদি সম্মত হয়ে শিশুকে আমার হাতে সমর্পণ করেন এবং আমি নিজ বাড়িতে তাঁকে দুধ পান করাতে পারি তবে অঙ্গীকার করছি যে, এই শিশুর হিফাযত ও দেখাশোনায় বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করব না। বলা বাহুল্য, তখন মূসা-জননীর মনে আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদাও জেগে উঠেছিল, যাতে বলা হয়েছিল যে, কয়েকদিন বিচ্ছেদের পর আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব। তাই তিনি নিজের

কথায় অটল রইলেন। অবশেষে ফিরাউন-পত্নী বাধ্য হয়ে তাঁর কথা মেনে নিলেন। মূসা-জননী সেদিনই মূসা (আ)-কে সাথে নিয়ে নিজ গৃহে ফিরে এলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ পদ্ধতিতে তাঁর লালন-পালন করলেন।

মূসা (আ) যখন একটু শক্ত-সমর্থ হয়ে গেলেন, তখন ফিরাউন-পত্নী তাঁর মাতাকে খবর পাঠাল যে, শিশুকে এনে আমাকে দেখিয়ে যাও। আমি তাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেছি। ফিরাউন-পত্নী দরবারের লোকদেরকে আদেশ দিল যে, আমার আদরের শিশু আজ আমার গৃহে আসছে। তোমাদেরকে তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং তাকে উপযুক্ত উপঢৌকন দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমরা কি করছ, আমি নিজে তা তদারক করব। এই আদেশ জারির ফলে মূসা (আ) যখন মাতার সাথে গৃহ থেকে বের হলেন, তখন থেকেই তাঁর উপর হাদীয়া ও উপঢৌকনের বৃষ্টি বর্ষিত হতে লাগল। অবশেষে তিনি যখন ফিরাউন-পত্নীর কাছে পেঁছিলেন, তিনি তখন স্বয়ং নিজের পক্ষ থেকে মূল্যবান উপঢৌকন পৃথকভাবে পেশ করলেন। ফিরাউন-পত্নী তাঁকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন এবং সমস্ত উপঢৌকন মূসা-জননীকে দান করে দিলেন। অতঃপর ফিরাউন-পত্নী বললেন ঃ এখন আমি ছেলেকে নিয়ে ফিরাউনের কাছে যাচ্ছি। সে-ও তাকে পুরস্কার ও উপঢৌকন দান করবে। সেমতে তাকে ফিরাউনের কাছে উপস্থিত করা হলে সে তাকে আদর করে কোলে তুলে নিল। মূসা (আ) ফিরাউনের দাঁড়ি ধরে নিচের দিকে হেচকা টান দিলে তখন সভাসদরা সুযোগ পেয়ে ফিরাউনকে বলল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, বনী ইসরাঈলের মধ্যে একজন নবী পয়দা হবে এবং আপনার দেশ ও সম্পত্তির মালিক হবে। আপনার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে আপনাকে ধরাশায়ী করবে। সেই ওয়াদা কিভাবে পূর্ণ হচ্ছে আপনি লক্ষ্য করেছেন কি?

ফিরাউন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। তৎক্ষণাৎ সন্তান হত্যাকারী সিপাহীদেরকে ডেকে পাঠাল, যাতে তাকে হত্যা করা হয়।

ইবনে-আব্বাস এখানে পেঁছে পুনরায় ইবনে জুবায়রকে বললেন ঃ এটা পরীক্ষার চতুর্থ পর্ব। মৃত্যু আবার মূসা (আ)-র মস্তকের উপর ছায়াপাত করল।

এই পরিস্থিতি দেখে ফিরাউন-পত্নী বলল ঃ তুমি তো এই বাচ্চা আমাকে দিয়ে ফেলেছ। এখন এ কি হচ্ছে? ফিরাউন বলল ঃ তুমি দেখ না, ছেলেটি কর্মের মাধ্যমে যেন দাবি করছে যে, সে আমাকে ধরাশায়ী করে দেবে, আমার বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। ফিরাউন-পত্নী বলল ঃ এ ব্যাপারে ফয়সালা করার জন্য তুমি একটি মূলনীতি মেনে নাও। এতে বাস্তব সত্য ফুটে উঠবে এবং বোঝা যাবে যে, ছেলেটি একাজ বালকসুলভ অজ্ঞতাবশত করেছে, না জেনেশুনে ইচ্ছাকৃতভাবে করেছে। দু'টি অঙ্গার এবং দু'টি মোতি আনা হোক এবং তার সামনে পেশ করা হোক। যদি সে মোতির দিকে হাত বাড়ায় এবং অঙ্গার থেকে আত্মরক্ষা করে, তবে বুঝতে হবে যে, তার কাজকর্ম জ্ঞান-প্রসূত ও ইচ্ছাকৃত। পক্ষান্তরে যদি সে মোতির পরিবর্তে অঙ্গারের দিকে হাত বাড়ায়,

তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে এ কাজটি জ্ঞানের অধীনে করেনি। কেননা, কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি আগুন হাতে নিতে পারে না। ফিরাউন এই প্রস্তাব মেনে নিল। দু'টি অঙ্গার এবং দুটি মোতি মূসা (আ)-র সামনে পেশ করা হল। তিনি হাত বাড়িয়ে অঙ্গার তুলে নিলেন। কোন কোন রিওয়ায়েতে রয়েছে যে, মূসা (আ) মোতির দিকে হাত বাড়াতে চেয়েছিলেন; কিন্তু জিবরাঈল তাঁর হাত অঙ্গারের দিকে ফিরিয়ে দেন। ব্যাপার দেখে ফিরাউন কালবিলম্ব না করে অঙ্গার তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, যাতে তার হাত পুড়ে না যায়। এবার ফিরাউন-পত্নী সুযোগ পেলেন। তিনি বললেনঃ ঘটনার আসল স্বরূপ দেখলে তো! এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায় মূসা (আ) প্রাণে বেঁচে গেলেন। কারণ, ভবিষ্যতে তাঁকে যে অনেক মহৎ কাজ করতে হবে। মূসা (আ) এমনিভাবে ফিরাউনের রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রমে ও রাজকীয় ভরণ-পোষণে মাতার কাছে লালিত-পালিত হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন।

তাঁর রাজকীয় সম্মান-সম্ভ্রম দেখে ফিরাউন বংশীয় লোকদের মধ্যে বনী ইসরাঈলের প্রতি জুলুম, নির্যাতন, অপমান ও অবজ্ঞা করার সাহস রইল না, যা ইতিপূর্বে তাদের পক্ষ থেকে বনী ইসরাঈলের ওপর অহরহ চলত। একদিন মূসা (আ) শহরের এক পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় দু'ব্যক্তিকে বিবদমান দেখতে পেলেন। তাদের একজন ছিল ফিরাউন বংশীয় অপর ব্যক্তি ইসরাঈল বংশীয়। ইসরাঈল বংশীয় ব্যক্তি মূসা (আ)-কে দেখে সাহায্যের জন্য ডাক দিল। ফিরাউন বংশীয় লোকটির ধৃষ্টতা দেখে মূসা (আ) নিরতিশয় রাগান্বিত হলেন। কারণ রাজদরবারে মূসা (আ)-র অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বিষয় অবগত হওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর সামনে ইসরাঈলীকে বলপূর্বক ধরে রেখেছিল। সে আরও জানত যে, মূসা (আ) ইসরাঈলীদের হিফাযত করেন। সাধারণভাবে সবাই একথা জানত যে, ইসরাঈলীদের সাথে তাঁর পক্ষপাতমূলক সম্পর্ক শুধু দুধ পান করার কারণেই। অবশ্য এটাও অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে তাঁর মাতার মাধ্যমে অথবা অন্য কোন উপায়ে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি ধাত্রীমায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি একজন ইসরাঈলী।

মোটকথা, মূসা (আ) রাগান্বিত হয়ে ফিরাউন বংশীয় লোকটিকে একটি ঘুষি মারলেন। ঘুষির তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে সে অকুস্থলেই প্রাণত্যাগ করল। ঘটনাক্রমে সেখানে মূসা (আ) ও বিবদমান দুই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তি তো নিহতই হল। ইসরাঈলী নিজের লোক ছিল, তাই ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল না।

যখন ফিরাউন বংশীয় লোকটি মূসা (আ)-র হাতে মারা গেল, তখন তিনি বললেনঃ

هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ —অর্থাৎ এ-কাজটি শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। সে প্রকাশ্য বিভ্রান্তকারী শত্রু। অতঃপর তিনি আল্লাহ্র দরবারে

رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَغَفَرَلَهٗ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ আরয করলেন ঃ

---হে আমার পালনকর্তা, আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি---আমার হাতে ভুলক্রমে ফিরাউন বংশীয় লোকটি নিহত হয়েছে। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

এ ঘটনার পর মূসা (আ) ভীতচকিত হয়ে এ ধরনের সংবাদ সংগ্রহ করতে থাকেন যে, ফিরাউন বংশীয় লোকদের ওপর এ হত্যাকাণ্ডের কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং ফিরাউনের দরবার পর্যন্ত বিষয়টি পৌঁছল কি না। জানা গেল যে, ঘটনার যে প্রতিবেদন ফিরাউনের কাছে পৌঁছেছে, তা এই ঃ জনৈক ইসরাঈলী ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। তাই ইসরাঈলীদের কাছ থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া হোক এবং এ ব্যাপারে তাদেরকে মোটেই অবকাশ না দেওয়া হোক। ফিরাউন উত্তরে বলল ঃ হত্যাকারীকে সনাক্ত করে প্রমাণসহ উপস্থিত কর। কারণ বাদশাহ্ যদিও তোমাদের আপন লোক ; কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া কাউকে বিনিময়ে হত্যা করা তার পক্ষে মোটেই শোভনীয় নয়। কাজেই হত্যাকারীকে তালাশ কর এবং প্রমাণাদি সংগ্রহ কর। আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে তোমাদের প্রতিশোধ হত্যার আকারে গ্রহণ করব। একথা শুনে ফিরাউন বংশীয়রা হত্যাকারীর সন্ধানে অলিতে-গলিতে ও বাজারে চক্কর দিতে লাগল ; কিন্তু হত্যাকারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

হঠাৎ একটি ঘটনা সংঘটিত হল। পরের দিন মূসা (আ) গৃহ থেকে বের হয়ে সেই ইসরাঈলীকে অন্য একজন ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তির সাথে লড়াইরত দেখতে পেলেন। ইসরাঈলী আবার তাঁকে দেখামাত্রই সাহায্যের জন্য ডাক দিল। কিন্তু মূসা (আ) বিগত ঘটনার জন্যই অনুতপ্ত ছিলেন। এক্ষণে সেই ইসরাঈলীকেই আবার লড়াইরত দেখে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, মূলত ইসরাঈলীই অপরাধী এবং কলহপ্রিয়। এতদসত্ত্বেও মূসা (আ) ফিরাউন বংশীয় ব্যক্তিকে বাধা দিতে চাইলেন এবং ইসরাঈলীকেও সতর্ক করে বললেন ঃ তুই গতকল্যও ঝগড়া করেছিলি, আজও তাই করছিস। কাজেই তুই-ই অপরাধী। ইসরাঈলী মূসা (আ)-কে গতকালের ন্যায় রাগান্বিত দেখে এবং একথা শুনে সন্দেহ করল যে, সে আজ আমাকেই হত্যা করবে। তখন সে কালবিলম্ব না করে বলে ফেলল ঃ হে মূসা, তুমি কি আমাকেও হত্যা করতে চাও, যেমন গতকাল একজনকে হত্যা করেছিলে।

এসব কথাবার্তার পর উভয়েই সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু ফিরাউন বংশীয় লোকটি হত্যাকারী অন্বেষণকারীদেরকে খবর দিল যে, স্বয়ং ইসরাঈলী মূসা (আ)-কে বলেছে যে, গতকাল তুমি একজনকে হত্যা করেছিলে। সংবাদটি তৎক্ষণাৎ রাজদরবারে পৌঁছানো হল। ফিরাউন একদল সিপাহী মূসা (আ)-কে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করল। সিপাহীদের বিশ্বাস ছিল যে, মূসা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না। তাই তারা ধীরে-সুস্থে শহরের মহাসড়ক ধরে তাঁর খোঁজে বের হল।

এদিকে শহরের দূরবর্তী অংশে বসবাসকারী মূসা (আ)-র জনৈক অনুসারী এ সংবাদ জানতে পারল যে, ফিরাউনের সিপাহী মূসা (আ)-র খোঁজে বের হয়ে পড়েছে। সে একটি ছোট গলির পথে অগ্রসর হয়ে মূসা (আ)-কে সংবাদ পৌঁছিয়ে দিল।

এখানে পৌঁছে ইবনে আব্বাস আবার ইবনে জুবায়রকে বললেন ঃ হে ইবনে জুবায়র, এটা হচ্ছে পরীক্ষার পঞ্চম পর্ব। মৃত্যু মাথার ওপর ছায়াপাত করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে এ থেকেও উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সংবাদ শুনে মূসা (আ) তৎক্ষণাৎ শহর থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং মাদইয়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তিনি আজ পর্যন্ত রাজকীয় বিলাসিতায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কষ্ট ও পরিশ্রমের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল না। মিসর থেকে বের হয়ে পড়েছেন বটে; কিন্তু পথঘাট অজানা। একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্র ওপর ভরসা ছিল যে,

عَسٰى رَبِّىْٓ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَآءَ السَّبِيْلِ আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে পথ প্রদর্শন করবেন।

মাদইয়ানের নিকটে পৌঁছে মূসা (আ) শহরের বাইরে একটি কূপের ধারে একটি জনসমাবেশ দেখতে পেলেন। তারা কূপে জন্তুদেরকে পানি পান করাচ্ছিল। তিনি আরও দেখলেন যে, দু'জন কিশোরী তাদের মেষপালকে আগলিয়ে পৃথক এক জায়গায় দণ্ডায়মান রয়েছে। মূসা (আ) কিশোরীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনারা পৃথক জায়গায় দণ্ডায়মান কেন? তারা বলল ঃ এত লোকের ভিড়ভাড় ঠেলে কূপের ধারে যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আমরা অপেক্ষা করছি, যখন লোকেরা চলে যাবে, তখন যে পানিটুকু অবশিষ্ট থাকবে, তাই আমরা মেষপালকে পান করাব।

মূসা (আ) তাদের আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে নিজেই কূপ থেকে পানি তুলতে লাগলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে প্রচুর শক্তিসামর্থ্য দান করেছিলেন। তিনি দ্রুত তাদের মেষপালকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করিয়ে দিলেন। কিশোরীদ্বয় তাদের মেষপাল নিয়ে গৃহে পৌঁছল এবং মূসা (আ) একটি বৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় নিলেন। তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করলেন ঃ

رَبِّ اِنِّىْ لِمَآ اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ—অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আমি সে নিয়ামতের প্রত্যাশী, যা আপনি আমার প্রতি নাযিল করবেন। উদ্দেশ্য এই যে, আহার ও বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিশোরীদ্বয় যখন দৈনন্দিন সময়ের পূর্বেই মেষপালকে পানি পান করিয়ে গৃহে পৌঁছল, তখন তাদের পিতা আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন ঃ আজ তো মনে হয় নতুন কোন ব্যাপার হয়েছে। কিশোরীদ্বয় মূসা (আ)-র পানি তোলা এবং পান করানোর কাহিনী পিতাকে বলে দিল। পিতা তাদের একজনকে

আদেশ দিলেন ঃ যে ব্যক্তি এই অনুগ্রহ করেছে, তাঁকে এখানে ডেকে আন। কিশোরী তাঁকে ডেকে আনল। পিতা মূসা (আ)-র বৃত্তান্ত জেনে বললেন ঃ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ---অর্থাৎ এখন যাবতীয় ভয়ভীতি মন থেকে মুছে ফেলুন। আপনি জালিমদের নাগালের বাইরে চলে এসেছেন। আমরা ফিরাউনের রাজত্বে বাস করি না। আমাদের ওপর তার কোন জোরও চলতে পারে না।

তখন কিশোরীদ্বয়ের একজন তার পিতাকে বলল ঃ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ ---অর্থাৎ আব্বাজান, আপনি তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা শক্ত সুঠামদেহী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি চাকুরীর জন্য অধিক উপযুক্ত। কন্যার মুখে একথা শুনে পিতা আত্মসম্মানে কিছুটা আঘাত অনুভব করলেন যে, আমার মেয়ে কিরূপে জানতে পারল যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। তাই তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কিরূপে অনুমান করলে যে, সে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত ? কন্যা বলল ঃ তার শক্তি তখনই প্রত্যক্ষ করেছি, যখন সে কূপ থেকে পানি তুলে সব রাখালের পূর্বে নিজের কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্য কেউ তার সমকক্ষ হতে পারেনি। বিশ্বস্ততার বিষয়টি এভাবে জানতে পেরেছি যে, যখন আমি তাকে ডেকে আনতে গেলাম, তখন প্রথম নজরে সে আমাকে একজন নারী দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিচু করে ফেলল। অতঃপর যতক্ষণ আমি আপনার পয়গাম তার গোচরীভূত করিনি, ততক্ষণ সে দৃষ্টি ওপরে তুলেনি। এরপর সে আমাকে বলল ঃ আপনি আমার পিছে পিছে চলুন ; কিন্তু পেছন থেকেই গৃহের পথ বলে দেবেন। একমাত্র বিশ্বস্ত ব্যক্তিই এরূপ কাজ করতে পারে। পিতা কন্যার এই বিজ্ঞজনোচিত কথায় আনন্দিত হলেন, তার কথার সত্যায়ন করলেন এবং নিজেও তার শক্তি ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেন। তখন কিশোরীদের পিতা [যিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র পয়গম্বর হযরত শুআয়ব (আ)] মূসা (আ)-কে বললেন ঃ আমি আমার এক কন্যাকে এই শর্তে আপনার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করতে চাই যে, আপনি আট বছর পর্যন্ত আমার এখানে চাকুরী করবেন। যদি আপনি স্বেচ্ছায় দশ বছর পূর্ণ করে দেন, তবে তা আরও উত্তম হবে ; কিন্তু আমি এই শর্ত আপনার প্রতি আরোপ করতে চাই না---যাতে আপনার কষ্ট বেশী না হয়। আপনি এই প্রস্তাব মঞ্জুর করেন কি ? হযরত মূসা (আ) এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। ফলে আট বছরের চাকুরী চুক্তি অনুযায়ী জরুরী হয়ে গেল, অবশিষ্ট দু'বছরের ওয়াদা তাঁর ইচ্ছাধীন রয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পয়গম্বর মূসা (আ)-কে দিয়ে এই ওয়াদাও পূর্ণ করিয়ে দেন এবং তিনি চাকুরীর দশ বছরই পূর্ণ করেন।

সাঈদ ইবনে জুবায়র বলেন ঃ একবার জনৈক খৃস্টান আলিমের সাথে আমার দেখা হলে তিনি প্রশ্ন করলেন, আপনার জানা আছে কি, মূসা (আ) উভয় মেয়াদের

মধ্য থেকে কোন্‌টি পূর্ণ করেছিলেন? আমি বললাম ঃ আমার জানা নেই। কারণ তখন পর্যন্ত হযরত ইবনে আব্বাসের এই হাদীস আমার জানা ছিল না। অতঃপর আমি হযরত ইবনে আব্বাসের সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বললেন ঃ আট বছরের মেয়াদ পূর্ণ করা তো চুক্তি অনুযায়ী জরুরীই ছিল। সাথে সাথে একথাও জানা দরকার যে, আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা ছিল তাঁর রসূল ইচ্ছাধীন ওয়াদাও পূর্ণ করুক। তাই তিনি দশ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন। এরপর আমি খৃস্টান আলিমের সাথে দেখা করে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন ঃ আপনি যার কাছ থেকে এ তথ্য অবগত হয়েছেন, তিনি কি আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আলিম? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সবার সেরা।

দশ বছর চাকুরীর মেয়াদ পূর্ণ করার পর যখন মূসা (আ) স্ত্রীকে সাথে নিয়ে শুআয়ব (আ)-এর দেশ মাদইয়ান থেকে রওয়ানা হলেন, তখন কনকনে শীত, গভীর অন্ধকার, অজ্ঞাত রাস্তা এবং নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় পথ চলতে চলতে হঠাৎ তিনি তূর পর্বতের ওপর আগুন দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি সেখানে গেলেন, বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখার পর লাঠি ও সুশুভ্র হাতের মু'জিযা এবং রিসালত ও নবুয়তের পদ লাভ করলেন। এর পূর্ণ কাহিনী ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত মূসা (আ) মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন যে, আমি রাজদরবারের পলাতক আসামী সাব্যস্ত হয়েছি। কিবতীকে খুন করার অভিযোগে আমার বিরুদ্ধে পাল্টা হত্যার আদেশ জারি হয়েছে। এক্ষণে ফিরাউনের কাছেই রিসালতের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। এছাড়া জিহ্বার দিক দিয়েও আমি তোতলা। এসব চিন্তাভাবনা করে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আবেদন-নিবেদন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রার্থনা অনুযায়ী তাঁর ভাই হারূনকে রিসালতে অংশীদার করে তাঁর কাছে ওহী প্রেরণ করলেন এবং আদেশ দিলেন যে, মিসর শহরের বাইরে এসে মূসা (আ)-কে অভ্যর্থনা জানাও। অতঃপর মূসা (আ) সেখানে পৌঁছলেন। হারূন (আ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। উভয় ভ্রাতা নির্দেশ অনুযায়ী ফিরাউনকে সত্যের দাওয়াত দেওয়ার জন্য তাঁর দরবারে পৌঁছলেন। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা দরবারে হাযির হওয়ার সুযোগ পেলেন না। তাঁরা প্রবেশদ্বারে অপেক্ষা করতে লাগলেন। এরপর অনেক পর্দা ডিঙ্গিয়ে হাযির হওয়ার অনুমতি পেলেন। উভয়েই ফিরাউনকে বললেন ঃ اِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ ---অর্থাৎ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে দূত ও বার্তাবাহী। ফিরাউন জিজ্ঞেস করল ঃ فَمَنْ رَّبُّكُمَا ---তোমাদের পালনকর্তা কে? মূসা ও হারূন (আ) কোরআনে উল্লিখিত উত্তর দিলেন ঃ رَبُّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ---এরপর ফিরাউন বলল ঃ তাহলে তোমরা কি চাও? সাথে সাথে সে নিহত কিবতীর কথা উল্লেখ করে মূসা (আ)-কে অপরাধী সাব্যস্ত করল এবং নিজ গৃহে মূসা (আ)-কে লালন-পালন করার অনুগ্রহের

কথা প্রকাশ করল। মূসা (আ) উভয় কথার যে জওয়াব দিয়েছেন, তা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে ত্রুটি স্বীকার করে অজ্ঞতার ওযর পেশ করলেন এবং গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার অনুগ্রহের জওয়াবে বললেন ঃ তুমি সমগ্র বনী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করে রেখেছ। তাদের ওপর নানা রকম অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছ। এরই ফলশ্রুতিতে ভাগ্যলিপির খেলায় আমাকে তোমার গৃহে পেঁছানো হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার যা ইচ্ছা ছিল, পূর্ণ হয়েছে। এতে তোমার কোন অনুগ্রহ নেই। অতঃপর তিনি ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আল্লাহ্ তা'আলায় বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং বনী ইসরাঈলকে মুক্তি দিতে সম্মত আছ? ফিরাউন অস্বীকার করে বলল ঃ তোমার কাছে রসূল হওয়ার কোন আলামত থাকলে দেখাও। মূসা (আ) তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন। অমনি তা অজগর সাপ হয়ে মুখ খুলে ফিরাউনের দিকে ধাবিত হল। ফিরাউন ভীত হয়ে সিংহাসনের নীচে আত্মগোপন করল এবং সাপটিকে বিরত রাখার জন্য মূসা (আ)-র কাছে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। মূসা (আ) তাকে ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বগলে হাত রেখে তা বের করতেই হাত ঝলমল করতে লাগল। ফিরাউনের সামনে এটা ছিল দ্বিতীয় মু'জিযা। এরপর হাত পুনরায় বগলে রাখতেই তা পূর্বাবস্থায় ফিরে এল।

ফিরাউন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল যে, ব্যাপার তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এখন আমাদের করণীয় কি? সভাসদরা সম্মিলিতভাবে বলল ঃ চিন্তার কোন কারণ নেই। তারা উভয়েই যাদুকর। যাদুর সাহায্যে তারা আপনাকে দেশ থেকে উচ্ছেদ করতে চায় এবং আপনার সর্বোত্তম ধর্ম (তাদের মতে ফিরাউনের পূজা) মিটিয়ে দিতে চায়। আপনি তাদের কোন দাবীর কাছে নতি স্বীকার করবেন না এবং চিন্তিতও হবেন না। কারণ আপনার রাজ্যে বড় বড় যাদুকর রয়েছে। তাদেরকে আহ্বান করুন। তারা তাদের যাদু দ্বারা তাদের যাদুকে নস্যাৎ করে দেবে।

ফিরাউন রাজ্যময় হুকুম জারি করে দিল যে, যারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী তাদের সবাইকে রাজদরবারে হাযির হতে হবে। সারা দেশের যাদুকররা সমবেত হলে তারা ফিরাউনকে জিজ্ঞেস করল ঃ যে যাদুকরের সাথে আপনি আমাদের মুকাবিলা করতে চান, সে কি করে? ফিরাউন বলল ঃ সে তার লাঠিকে সাপে পরিণত করে দেয়। যাদুকররা অত্যন্ত নিরুদ্বেগের স্বরে বলল ঃ এটা কিছুই নয়। লাঠি ও রশিকে সাপে পরিণত করার যে যাদু, তা পুরাপুরি আমাদের করায়ত্ত। আমাদের যাদুর মুকাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কিন্তু প্রথমে মীমাংসা হওয়া দরকার যে, আমরা জয়ী হলে আপনি আমাদেরকে কি পুরস্কার দেবেন।

ফিরাউন বলল ঃ জয়ী হলে তোমরা আমার পরিবারের সদস্য এবং বিশেষ নৈকট্য-শীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা যা চাইবে, তাই পাবে।

তখন যাদুকররা মুকাবিলার সময় ও স্থান মূসা (আ)-র সাথে পরামর্শক্রমে স্থির করল। তাদের ঈদের দিন দ্বিপ্রহরের সময় নির্ধারিত হল। ইবনে-জুবায়ের বলেন ঃ হযরত

ইবনে-আব্বাস আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের يوم الزينة (ঈদের দিন) ছিল আশুরা অর্থাৎ মুহররমের দশ তারিখ। এই দিনেই আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ফিরাউন ও তার যাদুকরদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন। যখন সবাই একটি বিস্তৃত মাঠে মুকাবিলা দেখার জন্য সমবেত হয়ে গেল, তখন ফিরাউনের লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলঃ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

---অর্থাৎ এখানে আমাদের অবশ্যই থাকা উচিত, যাতে যাদুকররা অর্থাৎ মূসা ও হারূন বিজয়ী হলে আমরা তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি। তাদের এই কথাবার্তা পয়গম্বরদ্বয়ের প্রতি বিদ্রূপের ছলে ছিল। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাদের যাদুকরের বিরুদ্ধে মূসা ও হারূন (আ) জয়লাভ করতে পারবেন না।

মুকাবিলার ময়দান জমজমাট হয়ে গেল। যাদুকররা মূসা (আ)-কে বললঃ প্রথমে আপনি কিছু নিক্ষেপ করবেন (অর্থাৎ যাদু প্রদর্শন করবেন), না আমরা নিক্ষেপ করে সূচনা করব? মূসা (আ) বললেনঃ তোমরাই সূচনা কর এবং তোমাদের যাদু প্রদর্শন কর। তারা بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ---(অর্থাৎ ফিরাউনের আনুকূল্যে আমরা অবশ্যই জয়ী হব।) বলে কিছু সংখ্যক লাঠি ও রশি মাটিতে নিক্ষেপ করল। লাঠি ও রশিগুলো দৃশ্যত সাপ হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। এ দৃশ্য দেখে মূসা (আ) কিছুটা ভয় পেলেন। فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ---মূসা (আ) মনে মনে ভীত হলেন।

একজন মানুষ হিসেবে এই ভয় স্বভাবগতও হতে পারে। পয়গম্বরগণও এরূপ স্বভাবগত ভয় থেকে মুক্ত নন। এছাড়া ভয়ের কারণ এরূপও হতে পারে যে, এখন ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়ে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে ওহীর মাধ্যমে তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। মূসা (আ) লাঠি নিক্ষেপ করতেই তা অজগর সাপ হয়ে গেল। সাপটির মুখ খোলা ছিল। সাপটি যাদুকরদের নিক্ষিপ্ত লাঠি ও রশির সাপগুলোকে মুহূর্তের মধ্যেই গলধঃকরণ করে ফেলল।

ফিরাউনের যাদুকররা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। এই দৃশ্য দেখে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হল যে, মূসা (আ)-র অজগরটি যাদুর ফলশ্রুতি নয়; বরং আল্লাহ্র দান। সেমতে যাদুকররা তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করল যে, আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং মূসা-(আ)-র আনীত ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। আমরা বিগত ধ্যান-ধারণা ও ধর্মবিশ্বাস থেকে তওবা করছি। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কোমর ভেঙ্গে দিলেন। তারা যেসব জাল বিস্তার করেছিল, সবই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ তারা সেখানে পর্যুদস্ত ও লাঞ্ছিত হয়ে মাঠ ত্যাগ করল।

যে সময় এই মুকাবিলা হচ্ছিল, তখন ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছিন্নবাস পরিহিতা হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে মূসা (আ)-র সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলেন। ফিরাউন বংশীয়রা মনে করছিল যে, তিনি ফিরাউনের চিন্তায় ছিন্নবাস পরিধান করেছেন, তার জন্য দোয়া করছেন। অথচ তাঁর সমস্ত ভাবনা ও চিন্তা মূসা (আ)-র জন্য নিবেদিত ছিল এবং তিনি তাঁরই বিজয় প্রার্থনা করছিলেন।

এই ঘটনার পর মূসা (আ) যখনই কোন মু'জিযা প্রদর্শন করতেন এবং আল্লাহ্‌র প্রমাণ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করত, তখনই ফিরাউন ওয়াদা করত ঃ এখন আমি বনী ইসরাঈলকে আপনার কর্তৃত্বে সমর্পণ করব। কিন্তু যখন মূসা (আ)-র দোয়ার ফলে আযাবের আশংকা টলে যেত, তখনই সে তার ওয়াদা ভুলে যেত। সে বলত ঃ আপনার পালনকর্তা আরও কোন নিদর্শন দেখাতে পারেন কি? দিন এভাবেই অতিবাহিত হতে লাগল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন-গোষ্ঠির ওপর ঝড়ঝঞ্ঝা, পঙ্গপাল, পরিধেয় বস্ত্রে উকুন, পাত্র ও খাদ্যদ্রব্যে ব্যাঙ, রক্ত ইত্যাদি আযাব চাপিয়ে দিলেন। কোরআন পাকে এগুলোকে "বিস্তারিত নিদর্শনাবলী" শিরোনামে বর্ণনা করা হয়েছে। ফিরাউনের অবস্থা ছিল এই যে, যখনই কোন আযাব আসত এবং তা দূর করতে সে অক্ষম হত, তখনই মূসা (আ)-র কাছে ফরিয়াদ করে বলত ঃ কোন রকমে আযাবটি দূরীভূত করে দিন। আমি ওয়াদা করছি, বনী ইসরাঈলকে মুক্ত করে দেব। অতঃপর আযাব দূরীভূত হলে সে ওয়াদা ভঙ্গ করত। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা মূসা (আ)-কে আদেশ দিলেন ঃ বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ কর। মূসা (আ) সবাইকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে শহর ত্যাগ করলেন। প্রত্যূষে ফিরাউন টের পেয়ে গোটা সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চাদ্ধাবন করল। এদিকে মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের গমন পথে যে নদী অবস্থিত ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আদেশ দিলেন ঃ যখন মূসা (আ) তোকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে, তখন তোর মধ্যে বারটি রাস্তা হয়ে যাওয়া উচিত। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্র এগুলো দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে পার হয়ে যাবে। তারা পার হয়ে গেলে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের সমেত নদীর বারটি পথ আবার একাকার হয়ে মিশে যাবে।

মূসা (আ) দরিয়ার নিকটে পৌঁছে দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত হানার কথাটি বেমালুম ভুলে গেলেন। বনী ইসরাঈল ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বলতে লাগল ঃ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

অর্থাৎ আমরা তো ধরা পড়ে যাব। কারণ পেছন দিক থেকে ফিরাউনী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন তাদের নজরে পড়ছিল। তাদের সামনে দরিয়া বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে-ছিল। এহেন সংকট মুহূর্তে আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা মূসা (আ)-র মনে পড়ল যে, দরিয়াকে লাঠি দ্বারা আঘাত করলে তাতে বারটি রাস্তা সৃষ্টি হয়ে যাবে। তিনি

তৎক্ষণাৎ লাঠি দ্বারা আঘাত হানলেন। এ সময়টি এমনি সংকটময় ছিল যে, বনী ইসরাঈলের পশ্চাৎবর্তী অংশকে ফিরাউনী সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল প্রায় ধরেই ফেলেছিল। হযরত মূসা (আ)-র মু'জিযায় দরিয়া পৃথক পৃথক ভাগে বিভক্ত হয়ে বারটি রাস্তা হয়ে গেল। মূসা (আ) বনী ইসরাঈল সহ এসব রাস্তা দিয়ে দরিয়া পার হয়ে গেলেন। পশ্চাদ্ধাবনকারী ফিরাউনী বাহিনী এসব রাস্তা দেখে গোটা অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী হাঁকিয়ে দিল। তারা সবাই যখন দরিয়ার মধ্যে ধাবমান ছিল, ঠিক তখনই আল্লাহ্‌র নির্দেশে দরিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর সংযুক্ত হয়ে গেল। দরিয়ার অপর পারে পৌঁছে মূসা (আ)-র সঙ্গীরা বললঃ আমাদের আশংকা হয় যে ফিরাউন বোধ হয় এদের সাথে সলিল সমাধি লাভ করেনি এবং সে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। তখন মূসা (আ) দোয়া করলেন যে, ফিরাউনের নিপাত আমাদের সামনে জাহির করা হোক। সে মতে আল্লাহ্‌র অপার শক্তি ফিরাউনের মৃতদেহকে দরিয়ার বাইরে নিক্ষেপ করল। ফলে বনী ইসরাঈলীদের সবাই তার মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করল।

এরপর বনী ইসরাঈল সম্মুখে অগ্রসর হয়ে পথিমধ্যে এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গমন করল। তারা স্বহস্তে নির্মিত প্রতিমার ইবাদত ও পূজায় লিপ্ত ছিল। এ দৃশ্য দেখে বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলতে লাগলঃ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا

إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ—إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ

---হে মূসা, আমাদের জন্যও মাবুদ তৈরী করে দাও, যেমন তারা অনেক মাবুদ করে নিয়েছে। মূসা (আ) বললেনঃ তোমরা এসব কি মূর্খতার কথাবার্তা বলছ? এরা যে প্রতিমার ইবাদত করছে, তাদের ইবাদত নিষ্ফল হবে। মূসা (আ) আরও বললেনঃ তোমরা পালনকর্তার এতসব মু'জিযা ও অনুগ্রহ দেখার পরও তোমাদের মূর্খতাসুলভ চিন্তাধারা বদলায়নি? এরপর মূসা (আ) তাদেরকে নিয়ে সামনে অগ্রসর হলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেনঃ তোমরা সবাই এখানে অবস্থান কর। আমি পালনকর্তার কাছে যাচ্ছি। ত্রিশদিন পর প্রত্যাবর্তন করব। আমার অনুপস্থিতিতে হারূন (আ) আমার স্থলাভিষিক্ত হবেন। তোমরা প্রতি কাজে তাঁর আনুগত্য করবে।

মূসা (আ) তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তূর পর্বতে গমন করলেন এবং আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে উপর্যুপরি ত্রিশ দিবারাত্রির রোযা রাখলেন, যাতে এরপর আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু ত্রিশ দিবারাত্র উপর্যুপরি রোযার কারণে স্বভাবত তাঁর মুখে এক প্রকার গন্ধ দেখা দেয়। ফলে তিনি ভাবতে লাগলেন যে, এই গন্ধ নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ অনুচিত। তিনি পাহাড়ী ঘাস দ্বারা মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করলেন। এরপর আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইরশাদ হলঃ মূসা, তুমি ইফতার করলে কেন? [আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল যে, মূসা (আ) কোন কিছু পানাহার করেন নি, শুধু ঘাস দ্বারা মুখ পরিষ্কার করেছেন;

কিন্তু পয়গম্বরসুলভ বিশেষ মর্যাদার কারণে একেই ইফতার বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।]
মূসা (আ) এই সত্য উপলব্ধি করে আরয করলেনঃ হে আমার পালনকর্তা, আমি মনে করলাম যে, আপনার সাথে আলাপরত হওয়ার পূর্বে মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দেই। আল্লাহ্ তা'আলা বললেনঃ তুমি কি জান না যে, রোযাদারের মুখের গন্ধ আমার কাছে মিশকের সুগন্ধি থেকেও অধিক প্রিয়? এখন তুমি ফিরে যাও এবং আরও দশদিন রোযা রাখ। এরপর আমার কাছে এস। মূসা (আ) তাই করলেন।

এদিকে মূসা (আ)-র সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল যখন দেখল যে, ত্রিশদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও মূসা (আ) ফিরে এলেন না, তখন তারা চিন্তিত হল। এদিকে হারূন (আ) মূসা (আ)-র চলে যাওয়ার পর বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে একটি ভাষণ দেন এবং বলেন যে, মিসরে অবস্থানকালে তোমরা ফিরাউনী সম্প্রদায়ের অনেক আসবাবপত্র ধার করেছিলে অথবা তারা তোমাদের কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। সেগুলো তোমরা সাথে নিয়ে এসেছ। তোমাদেরও অনেক আসবাবপত্র ফিরাউনীদের কাছে ধার অথবা গচ্ছিত আছে। এখন তোমরা মনে করছ যে, তাদের আসবাবপত্র তোমাদের আসবাবপত্রের বিনিময়ে তোমরা হস্তগত করে রেখেছ। কিন্তু তাদের ধার অথবা আমানতের জিনিস তোমরা ব্যবহার করবে---আমি এটা হালাল মনে করি না। কিন্তু অসুবিধা এই যে, এগুলো ফেরত দেবারও কোন উপায় নেই। তাই একটি গর্ত খনন করে সমস্ত অলংকার ও অন্যান্য ব্যবহারিক সামগ্রী তাতে ফেলে দাও। বনী ইসরাঈল এই আদেশ পালন করল। হারূন (আ) সব আসবাবপত্রে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে সব পুড়ে ছাই-ভস্ম হয়ে গেল। অতঃপর হারূন (আ) বললেনঃ এখন এগুলো আমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।

বনী ইসরাঈলের সাথে গাভী পূজারী সম্প্রদায়ের সামেরী নামক জনৈক ব্যক্তিও ছিল। সে বনী ইসরাঈলের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কিন্তু মিসর ত্যাগ করার সময় সে-ও মূসা (আ) ও বনী ইসরাঈলের সাথে চলে এসেছিল। ঘটনাক্রমে সে জিবরাঈল (আ)-এর একটি বিশেষ অলৌকিক প্রভাব দেখতে পেল (অর্থাৎ যেখানেই তিনি পা রাখেন, সেখানেই জীবনী-শক্তি সঞ্চারিত হয়ে যায়। জিবরাঈলের পা পড়েছে, এমন এক জায়গা থেকে সে এক মুষ্টি মাটি হাতে নিয়ে আসার পথে হযরত হারূন (আ)-এর সাথে তার দেখা হল। হারূন (আ) মনে করলেন যে, তার হাতে বোধ হয় কোন ফিরাউনী অলংকার রয়েছে। তাই বললেনঃ সবার মত তুমিও একে গর্তে ফেলে দাও। সামেরী বলল ঃ এটা তো সেই রসূলের পদচিহ্নের মাটি, যিনি আপনাদেরকে দরিয়া পার করিয়েছেন। আমি একে কিছুতেই গর্তে ফেলব না; তবে এই শর্তে ফেলব যে, আপনি আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য দোয়া করবেন। হারূন (আ)-দোয়ার ওয়াদা করলেন। সে ঐ মাটি গর্তে ফেলে দিল। ওয়াদা অনুযায়ী হারূন (আ) দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ্, সামেরীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। দোয়া শেষ হতেই সামেরী বলল ঃ আমার উদ্দেশ্য এই যে, গর্তে যেসব সোনা, রূপা, লোহা, পিতল ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হয়েছে, সেগুলো একটি গো-বৎসতে পরিণত হোক। হারূন (আ)-এর দোয়া কবুল হয়ে গিয়েছিল। ফলে গর্তের সমস্ত

অলংকার, লোহা, তামা, পিতল ইত্যাদি একটি গো-বৎসের আকার ধারণ করল। তাতে কোন আত্মা ছিল না; কিন্তু গাভীর মত শব্দ করত। হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ আল্লাহ্‌র কসম, এটা কোন জীবিত আওয়াজ ছিল না। বরং তার পশ্চাদ্ভাগ দিয়ে বায়ু প্রবেশ করে মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যেত। এর ফলে আওয়াজ শোনা যেত।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বনী ইসরাঈল কয়েক ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল সামেরীকে জিজ্ঞেস করলঃ এটা কি? সে বললঃ এটাই তো তোমাদের খোদা। কিন্তু মূসা (আ) পথ ভুলে এই খোদার কাছে না গিয়ে অন্য দিকে চলে গেছেন। একদল বললঃ মূসা (আ) যে পর্যন্ত আসল সত্য বর্ণনা না করেন, সে পর্যন্ত আমরা সামেরীর কথা অবিশ্বাস করতে পারি না। যদি বাস্তবে এটাই আমাদের খোদা হয়, তবে তার বিরোধিতা করে আমরা পাপী হব না। আর যদি এটা খোদা না হয়, তবে আমরা মূসা (আ)-র কথাই মেনে চলব।

অন্য একদল বললঃ এগুলো সব শয়তানী ধোঁকা। এই গো-বৎস আমাদের পালনকর্তা হতে পারে না। আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি না। অপর একদলের কাছে সামেরীর উক্তি চমৎকার বলে মনে হল। তারা সামেরীকে সত্য বিশ্বাস করে গো-বৎসকে খোদা হিসেবে মেনে নিল।

এই মহা অনর্থ দেখে হারূন (আ) বললেনঃ

يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي

অর্থাৎ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা পরীক্ষায় পতিত হয়েছ। তোমাদের পালনকর্তা দয়াময় আল্লাহ্। তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার কথা মেনে চল। বনী ইসরাইল বললঃ বলুন তো দেখি মূসা (আ)-র কি হল, তিনি আমাদের কাছে ত্রিশ দিনের ওয়াদা করে গিয়েছিলেন; এখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হচ্ছে তবুও তাঁর দেখা নেই। কোন কোন নির্বোধ বললঃ মূসা (আ) পালনকর্তাকে হারিয়ে বোধ হয় তাঁর খোঁজে ঘোরাফেরা করছেন।

এদিকে চল্লিশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর মূসা (আ) বাক্যালাপের গৌরব অর্জন করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এই অনর্থের সংবাদ দিলেন, যাতে তাঁর সম্প্রদায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিল فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ——মূসা (আ) সেখান থেকে ক্রোধান্বিত ও পরিতপ্ত অবস্থায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে যা বললেন, তা তুমি কোরআন পাকে পাঠ করেছ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ

---অর্থাৎ মূসা (আ) ক্রুদ্ধ হয়ে তার ভাই হারূনের মাথার চুল ধরে টান দিলেন এবং সাথে করে আনা তওরাতের ফলকগুলো হাত থেকে রেখে দিলেন। এরপর রাগ স্তিমিত হলে ভাইয়ের সত্যিকার ওযর জেনে তাকে ক্ষমা করলেন আর আল্লাহ্ তা'আলার

কাছে তাঁর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। এরপর সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি এ কাণ্ড করলে কেন? সে উত্তর দিলঃ

قَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ اَثَرِ الرَّسُوْلِ---অর্থাৎ আমি রসূল জিবরাঈলের পদচিহ্নের মাটি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম এবং আমি বুঝেছিলাম যে, এই মাটি যে বস্তুর মধ্যেই রাখা হবে, তাতেই জীবনের চিহ্ন সৃষ্টি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি গোপন রেখেছিলাম।

فَنَبَذْتُهَا وَكَذٰلِكَ سَوَّلَتْ لِىْ نَفْسِىْ---অর্থাৎ আমি এই মাটি অলঙ্কার ইত্যাদির স্তূপে রেখে দিলাম। আমার মন আমার সামনে এ কাজটি পছন্দনীয় আকারে উপস্থিত করেছিল।

قَالَ فَاذْهَبْ فَاِنَّ لَكَ فِى الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِسَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفَهٗ وَانْظُرْ اِلٰى اِلٰهِكَ الَّذِىْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهٗ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهٗ فِى الْيَمِّ نَسْفًا ـ

অর্থাৎ মূসা (আ) সামেরীকে বললেনঃ যাও, এখন তোমার শাস্তি এই যে, তুমি সারা জীবন একথা বলে বেড়াবেঃ আমাকে কেউ স্পর্শ করো না। নতুবা সে-ও আযাবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। তোমার জন্য একটি মেয়াদ নির্দিষ্ট রয়েছে, যার খেলাফ হবে না। তুমি যে উপাস্যের আরাধনা করেছ, তার পরিণাম দেখ, আমি একে আগুনে ভস্ম করব। অতঃপর এর ভস্ম দরিয়ায় ভাসিয়ে দেব। সে খোদা হলে তার সাথে এরূপ ব্যবহারের শক্তি আমাদের হত না।

তখন বনী ইসরাঈল স্থির বিশ্বাসে উপনীত হল যে, তারা পরীক্ষায় পতিত হয়েছিল। ফলে যে দলটি হযরত হারূন (আ)-এর মতাবলম্বী ছিল, তাদের প্রতি সবারই ঈর্ষা হতে লাগল (অর্থাৎ যারা মনে করত যে, গো-বৎস আমাদের খোদা হতে পারে না)। বনী ইসরাঈল এই মহাপাপ বুঝতে পেরে মূসা (আ)-কে বলল: আপনার পালনকর্তার কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাদের পাপমোচনের জন্য তওবার দ্বার উন্মুক্ত করে দেন।

মূসা (আ) এ কাজের জন্যে বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে সৎ কর্মপরায়ণ সত্তরজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে মনোনীত করলেন। তারা সজ্ঞানে গো-বৎস পূজা থেকেও বিরত ছিল। তিনি খুব যাচাই-বাছাই করে তাদেরকে মনোনীত করলেন। এই সত্তর জন মনোনীত সৎ কর্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে মূসা (আ) তূর পর্বতের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন,

যাতে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাদের তওবা কবুল করার বিষয়ে আবেদন পেশ করতে পারেন। মূসা (আ) তূর পর্বতে পৌঁছলে ভূপৃষ্ঠে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হল। এলে তিনি প্রতিনিধি দলের সামনে এবং স্বীয় কওম বনী ইসরাঈলের সামনে খুবই লজ্জিত হলেন। তাই আরয করলেন ঃ

رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, যদি আপনি তাদেরকে ধ্বংসই করতে চাইলেন, তো এই প্রতিনিধি দল আগমনের পূর্বেই ধ্বংস করে দিতেন এবং আমাকেও তাদের সাথে ধ্বংস করে দিতেন। আপনি কি আমাদের সবাইকে এ কারণে ধ্বংস করবেন যে, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক পাপ করেছে? প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকম্পের কারণ ছিল এই যে, মূসা (আ)-র সূক্ষ্ম যাচাই-বাছাই সত্ত্বেও এমন কিছু লোক কৌশলে এই প্রতিনিধি দলে শামিল হয়ে গিয়েছিল, যারা পূর্বে গো-বৎসের পূজা করেছিল এবং তাদের অন্তরে গো-বৎসের মাহাত্ম্য বিরাজমান ছিল।

মূসা (আ)-র এই দোয়া ও ফরিয়াদের জওয়াবে ইরশাদ হল ঃ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ ○

অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার অনুগ্রহ সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত। আমি অচিরেই আমার রহমতের পরওয়ানা তাদের জন্যে লিখে দেব, যারা আল্লাহ্ভীতি অবলম্বন করে, যাকাত আদায় করে, আমার নিদর্শনাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা সে নিরক্ষর রসূলের অনুসরণ করে, যার কথা তারা তাদের তওরাত ও ইনজীল গ্রন্থে লিখিত দেখে।

একথা শুনে মূসা (আ) আরয করলেন ঃ পরওয়ারদিগার, আমি আপনার কাছে আমার সম্প্রদায়ের তওবা সম্পর্কে আরয করেছিলাম। আপনি জওয়াবে আমার কওমসহ অন্য কওমকে রহমত দান করার কথা বলেছেন। আপনি আমার জন্ম আরও পিছিয়ে আমাকেও সে নিরক্ষর পয়গম্বরের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করলেন না কেন? অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বনী ইসরাঈলের তওবা কবুল হওয়ার একটি পদ্ধতি বলে দেওয়া হল। তা এই যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই তার পিতা, পুত্র ইত্যাদি স্বজনের মধ্যে যার সাক্ষাৎ পাবে, তাকেই তরবারি দ্বারা হত্যা করবে। যেস্থানে গো-বৎসের পূজা হয়েছে, সেখানেই এই পাইকারী হত্যাকাণ্ড চালাতে হবে।

প্রতিনিধিদলের যেসব সদস্যের অবস্থা মূসা (আ)-র জানা ছিল না। এবং তাদেরকে নির্দোষ মনে করে প্রতিনিধিদলে শামিল করা হয়েছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের মনে গোবৎস-পূজার আগ্রহ ছিল, এ সময় তারাও মনে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করে নিল। তারা এই কঠোর আদেশ পালন করল, যা তাদের তওবা কবুল হওয়ার জন্য জারি করা হয়েছিল, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজনকে হত্যা। এই আদেশ বাস্তবায়িত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'আলা হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি---সবার পাপ মার্জনা করে দিলেন। এরপর মূসা (আ) তওরাতের যেসব ফলক রাগান্বিত অবস্থায় রেখে দিয়েছিলেন, সেগুলো তুলে নিলেন এবং বনী ইসরাঈলকে সাথে নিয়ে পবিত্র ভূমি সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এমন এক শহরে উপনীত হলেন, যা 'জাব্বারীন' অর্থাৎ প্রবল প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তাদের আকার-আকৃতি ও দৈহিক গড়ন ভয়াবহ ছিল। তাদের অত্যাচার-উৎপীড়ন, শক্তি ও শান-শওকতের লোমহর্ষক কাহিনী বনী ইসরাঈলের শ্রুতিগোচর হল। মূসা (আ)-র ইচ্ছা ছিল যে, তিনি এই শহরে প্রবেশ করবেন; কিন্তু এই প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের অবস্থা শুনে বনী ইসরাঈল আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং বলতে লাগল: হে মূসা, এই শহরে ভয়ানক প্রতাপশালী অত্যাচারী সম্প্রদায় বাস করে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। যতক্ষণ তারা এই শহরে বর্তমান থাকবে, ততক্ষণ আমরা শহরে প্রবেশ করব না। হ্যাঁ, তারা যদি ত্যাগ করে কোথাও চলে যায়, তবে আমরা শহরে প্রবেশ করতে পারি।

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ---আলোচ্য রেওয়ায়েতের একজন রাবী ইয়াযিদ ইবনে হারূনকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস এই আয়াতের কিরাআত এভাবেই করেছেন কি? ইয়াযিদ বললেন: হ্যাঁ, তিনি আয়াতটি এভাবেই পাঠ করেছেন। আয়াতে رَجُلَانِ (দুই ব্যক্তি) বলে প্রতাপান্বিত সম্প্রদায়ের দু'ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে। তারা শহর থেকে এসে মূসা (আ)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বনী ইসরাঈলকে আতঙ্কগ্রস্ত দেখে তারা বলল: আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল। তোমরা তাদের দৈহিক গড়ন, বিশাল বপু ও সংখ্যাধিক্য দেখে ভয় পাচ্ছ। প্রকৃত সত্য এই যে, তাদের মধ্যে মনোবল বলতে মোটেই নেই। তারা মুকাবিলায় হীনবল। তোমরা শহরের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হলেই দেখবে যে, তারা অস্ত্র সংবরণ করে নিয়েছে। ফলে তোমরাই তাদের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।

কেউ কেউ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ---আয়াতের তফসীর এরূপ করেছেন যে, এই দুই ব্যক্তি মূসা (আ)-র সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের ছিল।

قَالُوْا يٰمُوْسٰى اِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَآ اَبَدًا مَّا دَامُوْا فِيْهَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ اِنَّا هٰهُنَا قٰعِدُوْنَ ○

অর্থাৎ বনী ইসরাঈল এ দুই ব্যক্তির উপদেশ শোনার পরও মূসা (আ)-কে কর্কশ ভাষায় অশোভন ভঙ্গিতে জওয়াব দিল ঃ হে মূসা, আমরা তো এই শহরে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই প্রবেশ করব না, যতক্ষণ এই শক্তিশালী কওম এখানে থাকবে। যদি আপনি তাদের মুকাবিলাই করতে চান, তবে আপনি এবং আপনার পালনকর্তা গিয়ে তাদের সাথে লড়াই করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম।

মূসা (আ) তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অগণিত নিয়ামত সত্ত্বেও প্রতি পদক্ষেপে তাদের অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রত্যক্ষ করে আসছিলেন; কিন্তু এ পর্যন্ত তিনি অপরিসীম ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। কখনও তাদের জন্য বদদোয়া করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাদের এই অনর্থক জওয়াব শুনে তিনি নিরতিশয় মনক্ষুণ্ন এবং দুঃখিত হলেন এবং তাদের জন্য বদদোয়া করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে 'ফাসেক' (পাপাচারী) শব্দ ব্যবহার করলেন। সাজা হিসাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেও তাদেরকে ফাসেক নাম দেওয়া হল এবং পবিত্র ভূমি থেকে চল্লিশ বছরের জন্য বঞ্চিত করে দেওয়া হল। এছাড়া তাদেরকে উন্মুক্ত প্রান্তরে এমনভাবে আবদ্ধ করে দেওয়া হল যে, অস্থির হয়ে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তারা কেবল চলতেই থাকত। কিন্তু আল্লাহ্র রসূল হযরত মূসা (আ)-ও তাদের সাথে ছিলেন। তাঁর বরকতে এই ফাসেক সম্প্রদায়ের প্রতি শাস্তির দিনগুলোতেও আল্লাহ্ তা'আলার অনেক নিয়ামত বর্ষিত হতে থাকে। তারা তীহ্ প্রান্তরে যেদিকেই যেত, মেঘমালা তাদের মাথার ওপর ছায়া দান করত। তাদের আহারের জন্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' নাযিল হত। তাদের পোশাক অলৌকিকভাবে ময়লাযুক্ত হত না এবং ছিন্ন হতো না। তাদেরকে একটি চৌকোণ পাথর দান করে মূসা (আ)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যখন তাদের পানির প্রয়োজন হয়, তখন এই পাথরে লাঠি দ্বারা আঘাত করবে। আঘাত করার সাথে সাথে পাথর থেকে বারটি ঝরনা প্রবাহিত হয়ে যেত। পাথরের প্রত্যেক দিক থেকে তিনটি করে ঝরনা প্রবাহিত হত। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের মধ্যে ঝরনা-গুলো নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল, যাতে বিবাদ সৃষ্টি না হয়। তারা যখনই এক জায়গা থেকে সফর করে অন্য জায়গায় তাঁবু ফেলত, তখন পাথরটিকেও সেখানে বিদ্যমান দেখতে পেত।---(কুরতুবী)

হযরত ইবনে আব্বাস এই হাদীসটিকে রসূলুল্লাহ্ (স)-র উক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। আমার মতে এটা সঠিক। কেননা মুআবিয়া (রা) ইবনে আব্বাসকে এই হাদীস বর্ণনা করতে শুনে হাদীসে বর্ণিত এই বিষয়বস্তু অস্বীকার করলেন যে, কিবতীর হত্যাকারীর সন্ধান ঐ দ্বিতীয় কিবতী বলে দিয়েছিল, যার সাথে ইসরাঈলী ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন লড়াইরত